# নির্মাণ

মননে. চিন্তায়.. গবেষণায়...

৬ষ্ট সংখ্যা, জুন ২০১১ ইং

সম্পাদক
ফজলে এলাহি মুজাহিদ

কম্পোজ
নির্মাণ কম্পিউটার্স

যোগাযোগ:
নির্মাণ
মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব
মোবাইল: +৯৬৬ ৫৯ ১৭ ৭০ ৫২০
ইমেইল: nirmanmagazine@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nirmanmagazine.com

## সূচীপত্র

_____সম্পাদকীয়: ১
স্রোতে নয়; সত্যে হোক প্রবাহ

_____ওহীর আলো: ২
জান্নাতের পথ বড়ই বন্ধুর-আল বাকারাহ্ : ২১৪নং আয়াত

_____নবীর বাণী: ৮
আমিই সময় এবং কাল, রাত-দিন আমারই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে!

_____সংস্কৃতি রীতিনীতি: ৯
আকীকা: পৃথিবীতে নতুন মানুষের জন্য আল্লাহর প্রশংসা

_____প্রবন্ধ নিবন্ধ: ১২
আসহাবে রাসূলের জীবনধারা : এ.কে.এম নাজির আহমদ
পর্ব// ২
বিভাজিত মানব- তুমি কতটা কার? : ফজলে এলাহি মুজাহিদ

_____গল্প কাহিনী: ২৩
আবীর : আতাউর রহমান সিকদার

_____ভ্রমণ স্মৃতিচারণ ৩১
প্রথম দেখায় কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্ট : তারিক রিদওয়ান

_____অনুবাদ সাহিত্য ৩৯
ইন দা আরলি আওয়ার্স: রিফ্লেকশন অন স্পিরিচুয়াল এন্ড সেলফ ডেভেলপমেন্ট
পর্ব// ৪ মূল: খুররম মুরাদ অনুবাদ : ফয়সাল তারিক

_____কবিতার পাতা: ৪২
তৃষ্ণা মেটালো একটি পুরোনো কিতাব : লিটন পাটোয়ারী
যতই ভুলি চির মৃত্যুরে : মাহবুবা সুলতানা লায়লা

_____জিজ্ঞাসা ও জবাব: ৪৩
জিজ্ঞাসা : ৬ থেকে ১১
জবাব দিচ্ছেন : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## স্রোতে নয়; সত্যে হোক প্রবাহ

জগৎ সংসারে "যেখানে যত ভীড়, সেখানে তত বেশী আকর্ষণ" -এমন একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। বিশ্বাস করিনি কখনো। আজন্ম স্রোতের বিপরীতে চলার একটা মানসিকতা থেকে বোধ হয় এ প্রয়াস হয়ত। কিন্তু যেখানে স্রোতের টানে চলাদের ভাগ শতক ছুঁই ছুঁই করে, সেখানে স্রষ্টা প্রদত্ত বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত না হলে টিকে থাকা দায়।

এমন চিন্তাগুলো আজকাল মগজের ডানে-বামে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। হিসেব মেলাতে পারছি না- যে কাজে এসেছিলাম এই পৃথিবীতে তার কিছু কি করতে পেরেছি এখনো? কিছু কি কুড়িয়ে নিতে পেরেছি, যা দেখিয়ে কোনমতে পেরিয়ে যাব ওপারের সাঁকো? প্রাসাদের বাসিন্দা না হই, ছোটখাটো কোন কুঁড়ে ঘর কি পাবো সেথায়?

পথ যতই বন্ধুর হোক, রাত্রি যতই তিমিরায়িত হোক, মরু যতই উষ্ণ-অপ্রান্ত হোক আর সাগর যতই উত্তাল হোক; একবার যখন সত্যের পথ চিনেছি, সত্যের তরীতে চড়েছি, পাড়ি আমাদেরকে দিতেই হবে। আমরা মুসলমান। জগতের স্রোতের বিপরীতে চলার জন্য আমাদের কালেমা, আমাদের প্রতীজ্ঞা, প্রত্যয়, সাধনা, বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং জয় কিংবা শাহাদাত। উম উম আয়েশী বিছানা, আবেশী নেশার খাবার পানীয়, বিলাস-বৈভবে গা এলিয়ে দেয়া, এসব শোভনীয় নয় মুসলিম জীবনে। কিন্তু বাস্তবতা আজ সত্য থেকে বড়ই বিমুখ। বিপর্যয় তাই আমাদের পিছু লেগে আছে ছায়ার মতই।

হোক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত সারা নগরী, তবু নগরীর ধ্বংসকামীদের স্রোতে বিপরীতমুখী একমাত্র ব্যক্তি হলেও এগিয়ে যেতে হবে, আহত হলেও মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, কেননা কখনো কখনো ক্ষীণ একটি ডাকও জনতার মন-সাগরে ঢেউ জাগাতে পারে। আমি জানি, এ বড়ই অত্যুক্তি যে, "নির্মাণ" তেমনি একটি অতি ক্ষীণ ডাক। এ আশায় যে, যদি কারো মন ছুঁতে পারে। যদি মন থেকে মনে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যদি চিন্তার জগতে ঝড় তুলতে পারে। হয়ত একদিন সে ঝড়ে তুমুল যোগে ছিন্নভিন্ন হবে মিথ্যার ঝান্ডা, সেখানে প্রতিস্থাপিত হবে সত্য। মিথ্যা বিতাড়িত হবে, সত্য সমাগত হবে। ("বিপরীতমুখী" শব্দটি মূলতঃ পার্থিব ভ্রান্ত প্রবাহের বিপরীতে সত্য-চিরন্তন যে ধারা, তাকে বুঝানোর জন্য এ লেখায় ব্যবহৃত। অন্যথা সত্যের স্রোত তো সর্বদাই সরল এবং সঠিক অভিমুখী; বিপরীতমুখী নয়।)

"নির্মাণ" সত্য ধারার পথের একটি পাথর কণা মাত্র। হয়ত একদিন পাথরে পাথরে পথ নির্মাণ করবে, সে পথ দেখাবে পথভোলাদের। হয়ত একটি ছোট্ট পাথর কণা হয়েই থাকবে। আমরা কেউই জানি না। ভবিষ্যৎ শুধু মহামহিমের হাতে। তবে এটুকু আকাংখা আমরা করবো যে, সত্যের এ পথ নির্মাণে আমরাও ছিলাম- "অংশীদার"।

-মদীনা মুনাওয়ারা, সউদি আরব।

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

**"কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ ভেবো না;**
**যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার কাজ হয়।"**

[মুসলিম: ২৬২৬]



## জান্নাতের পথ বড়ই বন্ধুর

### সূরা আল বাকারাহ্: ২১৪ আয়াত

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

**তিলাওয়াত:**

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

**বঙ্গানুবাদ:** তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সংগী-সাথী ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, অবশ্যই আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটে।

**নামকরণ:** বাকারাহ মানে গাভী। এ সূরার ৬৭নং থেকে ৭১নং পর্যন্ত আয়াতগুলোতে গাভীর উল্লেখ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা এসেছে। মূলতঃ এ সূরাটির নামকরণ হয়েছে শব্দচয়ন ভিত্তিক। শুধুমাত্র গাভী সম্পর্কিত আলোচনাই এসেছে, ব্যাপারটি তা নয়; বরং গাভী বা বাকারাহ্ শব্দটি শুধু নামের জন্য চয়ন করা হয়েছে।

**সূরা আল-বাকারাহ্র গুরুত্ব ও ফযীলত:**

১) সূরাটি সবচেয়ে বড় সূরা।
২) সূরাটি সবচেয়ে বেশী আহ্কাম সমৃদ্ধ।
৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরা পাঠ করার বিভিন্ন ফযীলত বর্ণনা করেছে: মুসলিম শরীফে আবু উমামাহ্ আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর; কেননা কেয়ামতের দিন এই কুরআন তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আসবে। তোমরা দু'টি পুস্প সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান তিলাওয়াত কর, কেননা কেয়ামতের দিন এ দু'টি সূরা এমনভাবে আসবে যেন এ দু'টি হচ্ছে দু'খণ্ড মেঘমালা অথবা দু'টুকরো কালো ছায়া অথবা দু'ঝাঁক উড়ন্ত পাখি। এ দু'টি সূরা যারা তিলাওয়াত করবে তাদের থেকে (জাহান্নামের আযাবকে) প্রতিরোধ করবে। তোমরা সূরা বাকারাহ্ তিলাওয়াত কর। কেননা, এর নিয়মিত তিলাওয়াত হচ্ছে বারাকাহ্ বা সমৃদ্ধি এবং এর তিলাওয়াত বর্জন হচ্ছে আফসোসের কারণ। আর যাদুকররা এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না'। [মুসলিম: ৮০৪]

ইমাম আহমাদ, দারেমী, হাকেম তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন: রাসূল (সা) বলেছেন: 'তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ কর। কেননা এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহ্লে বাতিল তথা যাদুকরের যাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। [ইমাম ইবনে কাসীর বলেন: সনদটি হাসান, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন: 'তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিওনা, নিশ্চয়ই শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায় যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করা হয়'। [মুসলিম: ৭৮০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পড়া হয় সেখানে শয়তান প্রবেশ করে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'প্রত্যেক বস্তুরই উচ্চ স্তম্ভ রয়েছে, কুরআনের সুউচ্চ শৃংগ হলো সূরা আল-বাকারাহ্'। [সহীহ ইবনে হিব্বান, তিরমিযী, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, হাকেম]

৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরামকে ডাকার সময় বলেছিলেন: 'হে সূরা আল-বাকারাহ্র বাহক (জ্ঞানসম্পন্ন) লোকেরা'। [মুসলিম]

৫) সূরা আল-বাকারাহ্ তিলাওয়াত করলে সেখানে ফিরিশ্তাগণ আলোকবর্তিকার মত অবতরণ করে। এ প্রসংগে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে বর্ণনা এসেছে। [বুখারী: ৫০১৮, মুসলিম: ৭৯৬, আহমাদ]

৬) যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সূরা আল-বাকারাহ্ জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করতেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে আমীর বানাতেন। [সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, বায়হাকীর দালায়েলুন্নাবুওয়াত]

৭) অনুরূপভাবে যারা সূরা আল-বাকারাহ্ এবং সূরা আলে-ইমরান জানতেন, সাহাবাদের নিকট তাদের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১২০, ১২১। শেখ আরনাউত বলেন: সনদটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে শুদ্ধ]

সর্বোপরি এ সূরাতে আল্লাহ্র "ইসমে 'আযম" রয়েছে, যার দ্বারা দো'আ করলে আল্লাহ্ সাড়া দেন। এ সূরায় এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। এ আয়াতটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, যাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

**নাযিলের সময়-কাল:** সূরাটি মাদানী। বেশীর ভাগ মদীনায় হিজরতের পরে মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে এবং কম অংশ পরে নাযিল হয়।

**বিষয়বস্তু:** জান্নাতের পথ খুব সহজ নয়। এর জন্য পরীক্ষা দিতে হবে। আর পরীক্ষাও খুব সহজ নয়। ঈমানের মান অনুযায়ী ছোট থেকে বড় হতে হতে এমন ভয়ংকর পরীক্ষাও এ পথে আসতে পারে, যার ভয়াবহতায় ঈমানদারগণ ও নবীগণ পর্যন্ত বলে উঠেন: "কবে আল্লাহর সাহায্য আসবে?" কিন্তু আল্লাহর সাহায্য আসবেই এবং তা অনিবার্য। প্রয়োজন শুধু ধৈর্য্য ও ঈমানের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া।

**ব্যাখ্যা:** এ আয়াত ও আয়াতের মাঝখান একটি পূর্ণাংগ কাহিনী অবর্ণিত রয়ে গেছে। আয়াতে এদিকে ইংগিত করা হচ্ছে এবং কুরআনের মক্কী সূরাগুলোয় (যেগুলো সূরা বাকারার পূর্ব নাযিল হয়েছে) এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার যে কোন দেশে যখনই নবীদের আর্বিভাব ঘটেছে তখনই তাঁরা ও তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী গোষ্ঠী আল্লাহদ্রোহী মানব সমাজের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। যে শয়তানী ও বিদ্রোহী শক্তি এ সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তার শক্তি চূর্ণ করার জন্য ঈমানদারদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ



করতে হয়েছে। ইবনে কাসীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে তার কুফরীর অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলেন- 'এই নবুয়তের দাবীদার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আপনাদের কোন যুদ্ধ হয়েছিল কি'? আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন- 'হাঁ'। হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- 'যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল'? তিনি বলেন- 'কখনো আমরা জয়যুক্ত হয়েছিলাম এবং কখনো তিনি।' হিরাক্লিয়াস বলেন- 'এভাবেই নবী আলাইহিমুস্ সালামদের পরীক্ষা হয়ে আসছে। কিন্তু পরিণামে প্রকাশ্য বিজয় তাদেরই হয়ে থাকে।' [ইবনে কাসীর]

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য-

**প্রথমত:** পরিশ্রম ও সাধনা ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই জান্নাত লাভ করতে পারবে না।

লোকেরা কি এমনি এমনি জান্নাতে প্রবেশ করার আশা করে বসে আছে? অথচ আল্লাহ্ সূরা আলে ইমরানের ১৪২ নং আয়াতে ঘোষণা করে দিয়েছেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.[آل عمران: 142]

"তোমরা কি মনে করে রেখেছ তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।"

পরীক্ষা ব্যতীত জান্নাতের যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। চাই তা যত বড় কিংবা যত ছোটই হোক না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল 'আনকাবূতের ২ ও ৩ নং আয়াতে বলেন-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ () وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ () [سورة العنكبوت: 2-3]

"লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, 'আমরা ঈমান এনেছি', কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।" শুধু কি জান্নাতের জন্য আল্লাহ্ পরীক্ষা নেবেন? না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল আনকাবূতের ২নং يُتْرَكُوا শব্দ ব্যবহার করে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যে, জান্নাত লাভ করার জন্য পরীক্ষা নেয়া হবে, কিন্তু জান্নাত লাভ করতে না পারলে জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে; কাউকেই ছেড়ে দেয়া হবে না। কারণ, আল্লাহর প্রতিদানে 'জান্নাত' ও 'জাহান্নাম'-এর বাইরে আর কোন তৃতীয় জায়গা তিনি রাখেননি। অতঃপর ৩ নং আয়াতে বলেন- ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদীদের তিনি পরীক্ষার দ্বারা চিনে নেবেন।

সূরা আল বাক্বারার ১৫৫ থেকে ১৫৭ নং আয়াতে মূলতঃ কারা সত্যানুসারী তাদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ () الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ () أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ () [سورة البقرة: 155-157]

"আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে এবং যখনই কোন বিপদ আসে বলে: "আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে, - তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও। তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে এবং এই ধরণের লোকরাই হয় সত্যানুসারী।"

হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: 'সবচেয়ে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর (মর্যাদার দিক থেকে) তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তিগণ। [ইবনে মাজাহ্: ৪০২৩]

**দ্বিতীয়ত:** নবীগণ ও তাদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে' এতে সন্দেহ নয়; বরং আল্লাহর ওয়াদা সত্য কিন্তু এর জন্য সময় ও স্থান নির্ধারিত নয়। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও শানে নবুয়তের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্ সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন।

এ প্রসঙ্গে খাব্বাব ইবন্ আরাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ সহীহ্ হাদীসে তিনি বলেন: আমি বল্লাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দো'আ করছেন না? (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমাদের পূর্ববর্তীগণও তাওহীদবাদী ব্যক্তি ছিল, যাদের মাথার উপরে করাত রেখে পা পর্যন্ত ফেঁড়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তারা তাওহীদের বিশ্বাস ও দ্বীনের অনুসরণ থেকে বিন্দুমাত্র সরে পড়েননি। আর কারো কারো দেহ থেকে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে গোশত আলাদা করা হয়েছিল, কিন্তু তবু তারা আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করেননি। তারপর বললেন: আল্লাহর শপথ! আমাদের এ দ্বীনকে আল্লাহ্ পরিপূর্ণ করবেনই। তখন যে কোন অশ্বারোহী সান'আ হতে হাদরামাউত পর্যন্ত আল্লাহর ভয় ছাড়া নির্ভয়ে পদচারণা করতে পারবে। তবে কারো এ ভয় আসা অন্য কথা যে, হয়ত তার ছাগলের উপর বাঘ আক্রমণ করবে। কিন্তু (আমি শংকিত) তোমরা দ্রুত বিজয় চাচ্ছো। [ইবনে কাসীর]

যে কোন আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে গেলে কিছু মানুষকে তো জীবন দিতেই হবে। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত আদর্শ এবং এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাই এর প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারে লড়াইয়ে যারা জীবন দান করবেন, তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সূরা আল বাক্বারার ১৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ () [سورة البقرة: 154]

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এই ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা থাকে না।" এছাড়াও এ প্রসংগে কুরআনুল কারীমে আরো বহু জায়গায় আল্লাহ্ আলোচনা করেছেন। যেমন:



বাকারাহ্: ২০৭, ২৪৫, আলে-ইমরান: ১৪২, ১৬৯, তাগাবুন: ১১, ১৫, ১৬, তাওবাহ্: ২৪, আহযাব: ১১, মুলক: ২, হাদীদ: ২২, মুহাম্মাদ: ৩১, মুনাফিকূন: ৯।

মূলতঃ এই পুরো দুনিয়াটাই তো মুমিনের জন্য একটি কারাগার স্বরূপ। তাই কারাগারে দুঃখ-কষ্ট থাকবেই। এ কথাটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে জানিয়ে গেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ–قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. [رواه مسلم: 205/14، الشاملة: 5256]

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু থকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুনিয়াটা হলো মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।" [মুসলিম: ১৪/২০৫]

আজকে যারা শাসক, অত্যাচার অবিচারের মাধ্যমে অতীষ্ট করে তুলছে সত্যপন্থীদের জীবন, তারাই যে চিরদিন ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকে, একথা সত্য নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে ক্ষমতার আবর্তন ঘটান। তিনি বলেন-

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. [سورة آل عمران: 140]

"মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মুমিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন।" [সূরা আলে ইমরান: ১৪০] এ সম্পর্কিত আরো আলোচনা এসেছে- হজ্জ: ৫৮-৫৯, আলে ইমরান: ১৫৭, ১৬৯, ১৯৫, বাকারাহ্: ১৫৪, মুহাম্মাদ: ৪-৬, ইয়াসীন: ২৬, মুমিন: ২৮ ও বুরূজ: ৮-৯।

কখনো কখনো বাতিলপন্থী শক্তির অত্যাচার এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, নবীগণ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দো'আ করেছিলেন এই বলে যে, "এখন আপনিই প্রতিশোধ গ্রহণ করুন!"- فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ () [سورة القمر: 10]

"তিনি তার রবকে ডেকে বললেন: আমি পরাভূত, এখন আপনিই প্রতিশোধ গ্রহণ করুন!" [সূরা কামার: ১০]

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যাদেরকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেন, তিনি মাত্র চারটি কাজ দাবী করেন তাদের কাছ থেকে। অথচ তারা মাত্র এ চারটি কাজ ভুলে গিয়ে খোদ সে খোদার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করাকে নিজেদের কাজ মনে করতে থাকে এবং আল্লাহর নবী ও তাদের অনুসারীদের উপর অত্যাচারকে নিজেদের সাফল্য ভাবতে থাকে। আল্লাহ্ বলেন-

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. [سورة الحج: 41]

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সব কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্র ইখতিয়ারে।" [সূরা আল-হজ্জ: ৪১]

যে জীবন নিয়ে মুমিনগণ শংকিত, আসলে কি সে জীবনের মালিক তারা নিজেরা? না; বরং ঈমান আনার সাথে সাথে তাদের রবের সাথে এমন এক ব্যবসায়িক

চুক্তিতে জড়িয়েছে যার পণ্য হলো তাদের নিজ নিজ জীবন ও সম্পদ। ব্যবসার লাভ হিসেবে তারা পাবে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের বিনিময়ে অনন্ত সুখের জান্নাত। তাই মুমিনদের জীবন ও সম্পদ যে সুযোগ্য ব্যবসায়ী ক্রয় করে আবার মুমিনদের নিকটই এর ব্যবহারের জন্য জমা রেখেছেন, মুমিনদের কি উচিত নয় চুক্তি অনুযায়ী তাঁর কথা মেনে চলা? অবশ্যই; বরং তাতেই রয়েছে মহাসাফল্য। যারা তা বুঝতে পারে, তারাই এগিয়ে যায় কষ্ট, ক্লেশ, গ্লানি ও মৃত্যুর বিভিষিকাময় আল্লাহর পথে। তারা সে পথে যুদ্ধ করে! তারা আল্লাহর শত্রুদের মারে ও নিজেরাও ইসলামের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়। আল্লাহ্ বলেন-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ () [سورة التوبة: 111]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, মারে ও মরে। তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্র চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং ওটাই তো মহাসাফল্য।" [সূরা তাওবাহ্: ১১১]

তদুপরি পৃথিবী তো নিঃশেষের জন্যই সৃজিত হয়েছে। এখানে কেউ থাকবে না; কিছুই থাকবে না। সবাইকেই চলে যেতে হবে। আর এতে রয়েছে ভাল ও মন্দ। যদি চলেই যেতে হয় তবে মন্দকে নিয়ে কেন যাবো? ভালো নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ ডাকছেন মানুষকে- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. [سورة الأنبياء: 35]

"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থার মধ্যে ফেলে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করছি, শেষ পর্যন্ত তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে।" [সূরা আল আম্বিয়া: ৩৫]

**শিক্ষা:** ১. জান্নাতে প্রবেশ করা খুব সহজ নয়। ২. জান্নাত লাভের জন্য পরীক্ষা দিতে হবে। ৩. পরীক্ষার বিষয়গুলো যথাক্রমে সম্পদের ক্ষতি, ক্ষুধা, ভয়, ব্যাধি; এমনকি জীবন বিনাশও হতে পারে। ৪. ঈমানের মান অনুযায়ী পরীক্ষায় কঠোরতা হয়ে থাকে। ৫. ধৈর্য্যের সাথে উত্তীর্ণ হলে সে অনুযায়ী ফলাফল ও মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে। ৬. আল্লাহর সাহায্য মুমিনদের খুব নিকটেই থাকে।

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

**www.islam.net.bd** -বাংলা ভাষায় এ যাবৎ কালের সর্ববৃহৎ অনলাইন ইসলামিক

লাইব্রেরী। আজই ভিজিট করুন, বন্ধুদের জানিয়ে দিন, কল্যাণ অর্জন করুন এবং কল্যাণের পথে সহযোগী হোন- অধ্যয়নে, আহ্বানে -ও দানে।

-প্রচারে: সময়নির্মাণ ওয়েব কমিউনিটি।



## আমিই সময় এবং কাল, রাত-দিন আমারই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে! [মুসলিম থেকে]

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: মহামহিম আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান সময়কে গালি দেয়। অথচ আমিই সময় এবং কাল, রাত-দিন আমারই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

টীকা: "আমিই সময়"-এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন বিশ্বের সময় জ্ঞাপক শক্তি। বরং এর অর্থ হচ্ছে রাত-দিনের আগমন-নির্গমন, রাতের পেছনে দিন ও দিনের পেছনের রাতের আগমন, ঋতুর পরিবর্তন, সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই সময়কের নিয়ন্ত্রণ করেন। এসব কিছুই তাঁর হুকুমের অধীন।

[হাদীস নং- ৫৬৯৭ (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: মহান আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান যুগ এবং সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। সময় তো আমারই নিয়ন্ত্রণে। রাত-দিনের পরিবর্তন আমিই করে থাকি।

[হাদীস নং- ৫৬৯৮ (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا.

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান "হে হতভাগা সময়" বলে আমাকে কষ্ট দেয়। অতএব, তোমাদের কেউ যেন "হে সময়! তোমার জন্য দুঃখ হয়" না বলে। কেননা, আমিই সময়। রাত-দিনের আবর্তন-পরিবর্তন আমিই করে থাকি। আমি যখন ইচ্ছে করব, দু'টোই বিলুপ্ত করে দেব।

[হাদীস নং- ৫৬৯৯ (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ.

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের কেউ যেন "হে সময়-কাল! তোমার জন্য আফসোস" -এরূপ না বলে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাই সময় অর্থাৎ, সময় তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

[হাদীস নং- ৫৭০০ (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ.

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সময়কে গালি দিও না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাই সময়।

[হাদীস নং- ৫৭০১ (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)]

## আকীকা: পৃথিবীতে নতুন মানুষের জন্য আল্লাহর প্রশংসা

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃজিত এ পৃথিবীকে আবাদ রাখার জন্য সচল মানুষের মধ্যে যেন এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এখানে মানুষকে যদি ইচ্ছে দেয়া হত তাহলে বোধহয় পৃথিবীটা অনেক আগেই বরবাদ হয়ে যেত। বরং তিনি তা জানেন, তাই তিনি মানুষের আনন্দের মাঝে রেখেছেন তাঁর পৃথিবী আবাদের বীজ। মানুষের বুকের মাঝে রেখেছেন সে বীজ থেকে অঙ্কুরীত চারার প্রতি সীমাহীন ভালবাসা এবং মানুষের নৈতিকতার মধ্যে রেখেছেন সে চারাকে আদরে যত্নে পরিচর্যায় মহীরূহ করে তোলার সাধনা। এভাবেই তো পৃথিবী আজো টিকে আছে।

যখন মায়ের গর্ভে সন্তান আসে, তখন থেকে পিতামাতার মন আনন্দে ভরে উঠে। কেমন আছে অনাগত সন্তান, কেমন থাকা উচিত, কতটা খাবার দেয়া উচিত, কতটা বিশ্রাম নেয়া দরকার মায়ের, কত বড় হচ্ছে সন্তান ইত্যাদি সব জানার জন্য নিয়মিত ডাক্তারের কাছে হাযিরা দেয়াসহ সাধ্যের সবটুকু যেন উজাড় করে দেন দম্পতি। তারপর ঠিক একদিন পৃথিবীতে চলে আসে পৃথিবীর একজন নতুন সদস্য। সেদিন যেন আনন্দ আর ধরে না সে সংসারে। চারদিকে হাসি আর হাসির মাঝে শিশুর কান্না যেন নতুন এক ঝংকার তোলে সারাটা পরিবেশে।

না, শুধু জমকালো উল্লাসের অন্ধকারে হারিয়ে গেলে চলবে না; বরং আসল উল্লাস কি তা জানতে হবে। কে মায়ের পেটে এক বিন্দু শুক্র হতে একটি জীবনের সূচনা করলেন, কে তাকে দিনে দিনে মানুষের আকৃতি দিলেন, কে তাকে সুস্থ-সম্পূর্ণ রূপে পৃথিবীতে নিয়ে আসলেন, তাঁকে ভুলে গেলে হবে না। বরং তাঁর প্রশংসার মাঝেই যে প্রকৃত আনন্দ রয়েছে, সে আনন্দ খুঁজে নিতে হবে, লুফে নিতে হবে আমাদেরকে।

আমরা মানুষ অজ্ঞ, অক্ষম, সামান্য। তাই মহামহীয়ান স্রষ্টা আল্লাহ্ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন- তিনি কে, কি করতে পারেন; এমনকি এ সন্তান একমাত্র তাঁরই দয়ার দান, তাই তাঁরই প্রশংসা করা উচিত সর্বাগ্রে। কিভাবে করতে হবে সে পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছন তাঁর নবীর মাধ্যমে। হাঁ, সে পদ্ধতির ইসলামী পরিভাষা হলো- "আকীকা"।

আকীকা অর্থ কাটা, অর্থাৎ সন্তান জন্ম নেয়ার পর যে পশু জবাই করা হয় তাকে বলে আকীকা। অধিকাংশ আলেমের মতে আকীকা সুন্নত। তবে কেউ কেউ আকীকা ওয়াজিব বলেছেন। ইসলামের পূর্বেও আকীকার প্রথা প্রচলিত ছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার বাবা বুরাইদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً ، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

'জাহেলী যুগে আমাদের নিয়ম ছিল, যখন আমাদের কারো পুত্র সন্তান জন্ম নিত, সে একটি ছাগল জবাই করত এবং এর রক্ত তার মাথায় লাগিয়ে দিত। কিন্তু আল্লাহ যখন ইসলাম নিয়ে আসলেন, তখন আমরা একটি ছাগল জবাই করতাম এবং তার মাথা নেড়ে করতাম আর তাকে জাফরান দিয়ে মাখিয়ে দিতাম।' [আবূ দাউদ: ২৮৪৩; বাইহাকী:



১৯৭৬৬; মুস্তাদরাক: ৭৫৯৪] অন্য এক হাদীসে সুগন্ধীর কথাও এসেছে। [দেখুন- বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা : ১৯৭৬৭।]

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে তার জন্য আকীকা করা এবং তার মাথা নাড়া করা ও তার নাম রাখা জরুরী। সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

.....تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

'.....জন্মের সপ্তম দিনে তার জন্য জবাই করা হবে এবং তার মাথা নেড়ে করা হবে আর নাম রাখা হবে। [আবূ দাউদ: ২৮৪০; মুসনাদ আহমদ: ২০০৯৫] নামের ক্ষেত্রে আল্লাহর পছন্দনীয় নামসমূহ থেকে অথবা উত্তম নাম রাখা উচিত।

শিশুদের জন্য আকীকা করা অন্য নবীদের শরীয়তেও ছিল। কিন্তু ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু এর ধারা প্রকৃতি অন্যদের চেয়ে আলাদা। যেমন ইয়াহূদীরা তাদের কন্যা সন্তানের আকীকা দিত না আর ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে উভয়ের আকীকা দিতে হবে এবং কেমন হবে তাও দেখিয়ে দিয়েছে। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلاَمِ وَلاَ تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ فَعُقُّوا عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

'ইহুদীরা পুত্র সন্তানের আকীকা করতো কিন্তু কন্যা সন্তান হলে তার আকীকা করতো না। অতএব তোমরা পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল দিয়ে আকীকা করো।' [বাইহাকী, সুনান আল-কুবরা: ১৯৭৬০; মুসনাদ বাযযার: ৮৮৫৭]

শিশুর মাথা মুণ্ডন করার সময় পুরো মাথা মুণ্ডন করতে হবে, কিছু কিছু রেখে দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা' থেকে বারণ করেছেন। তিনি বলেন, নাফে'কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাযা' কী? তিনি বললেন, বাচ্চার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডানো আর কিছু অমুণ্ডিত রাখা'। [মুসলিম: ৩৯৫৯; বুখারী: ৫৪৬৫; ইবন মাজা: ৩৬২৭; আহমদ: ৪৯২৮]

মূলতঃ আকীকার দ্বারা বেশ ক'টি ফায়দা অর্জন সম্ভব- ১.সন্তান দানের জন্য দয়াময়, দাতা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করা, ২.সন্তানের পরিচিতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা, ৩.সন্তানকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার মানসিকতা অর্জন করা ঠিক যেমন মানসিকতা ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তানের ব্যাপারে নিজের মধ্যে ধারন করেছিলেন, ৪.আত্মীয়-স্বজনকে সন্তানের জন্য কল্যাণ প্রার্থনার সুযোগ করে দেয়া ও এর মাধ্যমে পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং ৫.আকীকা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবেশী গরীব-মিসকীনদের অন্তত এক বেলা ভোজের আয়োজন হওয়া।

নবজাতকের পিতার সাথে সাক্ষাতের সময় যে দো'আ করা উত্তম তা আমরা জানতে পারি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু মুখ থেকে। তিনি এক নবজাতকের পিতাকে অভিবাদন জানিয়ে বলেন-

بارَكَ اللّٰهُ لكَ فِي الموهوب لك وشكرتَ الواهبَ وبلغَ أشدَّه ورُزقت برَّه.

'তোমাকে যা দান করা হয়েছে আল্লাহ তাতে বরকত দিন। তুমি দানকারীর শুকরিয়া আদায় করো, সে তার বয়স পুরো করুক এবং তোমাকে তার পুণ্য প্রদান করা হোক।' [মুসনাদ ইবনুল জা'দ: ১৪৪৮; ইবন আদী, আল-কামেল: ৭/১০১; ইনব আবিদ্দুনইয়া, আল-ইয়াল: ১/২০১]

আকীকার পশুর গোশত কিভাবে কাজে লাগাতে হবে এ দিকনির্দেশনা সম্পর্কে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্ তার সন্তানের আকীকার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন- 'আমি আমার সন্তানের আকীকা দিয়েছি। প্রথমে যেসব ভাই ও অন্যদের দাওয়াত দিয়েছি তাদের যা খাওয়াবার ইচ্ছে করেছি তা জবাই করলাম। তারপর তাদের খাবার প্রস্তুত করলাম। এরপর আকীকার ছাগল জবাই করলাম। তা থেকে প্রতিবেশিদের হাদিয়া দিলাম। পরিবারের লোকেরা গোশত খেল। হাড়-হাড্ডি যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলো টুকরো করে রান্না করলাম। তারপর প্রতিবেশিদের আবার সেগুলো খাওয়ার দাওয়াত দিলাম। তারা খেল আর আমরাও খেলাম। মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, অতএব যার অর্থের প্রাচুর্য রয়েছে, আমি চাই তিনি এমন করবেন। আর যার নাই, তিনি আকীকা জবাই করবেন এবং সেখান থেকে খাবেন ও খাওয়াবেন।' [আল-মুনতাকা : ৩/১০৪।]

এছাড়া আকীকার পশুর চামড়া ও অন্যান্য অংশের ব্যাপারে ইবন রুশদ সুন্দর বলেছেন, তিনি বলেন- 'আকীকার গোশত, চামড়া এবং এর যাবতীয় অংশের বিধান খাওয়া, সদকা করা ও বেচার দিক থেকে কুরবানীর পশুর মতোই।' [বিদায়াতুল মুজতাহিদ: ১৩৭৭]

সর্বোপরি সন্তান আমাদের উত্তরাধিকার। তার জীবনের শুরুতে তার জন্য আমাদের যা করণীয় তা যেন সঠিক ইসলামী পদ্ধতিতে হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। আকীকা দেয়া, ইসলামী অন্যান্য রীতিনীতির অনুসরণ করা, সুন্দর একটি নাম রাখা ইত্যাদি। কেননা, কেয়ামতের দিন এ সুন্দর নামটির সাথে পিতার নাম যোগ করেই যে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে তাকে ডাকা হবে। সেদিন যেন সে সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তার জন্য তার পিতামাতারও মুক্তি লাভ হয়, সে জন্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকেই সন্তানের পিতামাতাকে আজীবন সাধনা করে যেতে হবে। আকীকা তো জীবনব্যাপী সে সাধনার শুরুটা মাত্র।

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

**www.banglatafheem.com** **-তাফহীমুল কুরআন।**

*এখন সম্পূর্ণ তাফসীরটি ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে উপরের ঠিকানায়। এমনকি সফ্টওয়্যার আকারে ডাউনলোড করে অফলাইনে পড়ার সুবন্দোবস্তও রয়েছে। অনলাইনে পড়ার এবং দৈনিক কতটুকু পড়েছেন, রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সে সুবিধাও রয়েছে। আজই ভিজিট করুন এবং বন্ধুদের জানিয়ে দিন।*

-প্রচারে: সময়নির্মাণ ওয়েব কমিউনিটি।



# আছহাবে রাসূলের জীবনধারা

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

(মে সংখ্যার পর...)

## ৩। আছহাবে রাসূলের ঈমানী দৃঢ়তা ছিলো অসাধারণ

তখন ঈমানের ঘোষণা দেয়া মানেই ছিলো জীবনের ঝুঁকি নেওয়া।
ঈমানের বলে বলীয়ান আছহাবে রাসূল কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতার কাছে হার মানেননি।

নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েও তাঁরা আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের কথাই উচ্চারণ করে গেছেন।

☐ উসমান ইবনু আফফান (রা)।

ইসলাম গ্রহণ করায় তিনি তাঁর চাচা আল হাকামের হাতে নির্যাতিত হন।
বার বার দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েও তিনি বলেন, "আপনাদের যা ইচ্ছা তা-ই করুন। এই দীন আমি কখনো ত্যাগ করবো না।"
একবার তাঁকে একাধারে কয়েকদিন কিছু খেতে বা পান করতে দেয়া হয়নি।
তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় দারুন কষ্ট পান। কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি হননি।
এক পর্যায়ে ঘরদোর, ব্যবসা-বাণিজ্য, উট-ঘোড়া-ভেড়া সব কিছু পেছনে ফেলে তিনি হাবশায় হিজরত করেন।

☐ মুস'য়াব ইবনু উমাইর (রা)।

তিনিও তাঁর গোত্রের লোকদের দ্বারা নির্যাতিত হন।
বেশ কিছু দিন তিনি কুঠরিতে বন্দী অবস্থায় দিন কাটান।
অতপর কোন প্রকারে সেখান থেকে বেরিয়ে ঈমানের ঐশ্বর্য বুকে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে হাবশা চলে যান।

☐ ইয়াসির (রা)।

তিনি ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী।
আবু হুজাইফা ইবনুল মুগীরা আল মাখযুমীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তিনি মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন।
তিনি ছিলেন প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন।
সারাদিন রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে তাঁকে শাস্তি দেয়া হতো।
দিনের পর দিন তিনি এই শাস্তি ভোগ করেছেন। কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করতে রাজী হননি।
একদিন আবু জাহল একটি লাঠি দিয়ে তাঁকে অনবরত পিটাতে থাকে। পিটুনি খেতে খেতে তিনি শহীদ হয়ে যান।

☐ সুমাইয়া বিনতু খুব্বাত (রা)।

তিনি ছিলেন ইয়াসির (রা)-এর স্ত্রী।
স্বামীর সাথে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন।
তাঁকেও সারাদিন রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দেয়া হতো।

একদিন দিনভর শাস্তি ভোগের পর তিনি ক্লান্ত দেহে শ্লথ গতিতে তাঁর ডেরার দিকে ফিরছিলেন।

পথে তিনি আবু জাহলের সামনে পড়েন। আবু জাহল তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতে বলে। তিনি সম্মত হলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে আবু জাহল তাঁকে লক্ষ্য করে তার হাতের বল্লমটি ছুঁড়ে মারে। সেই বল্লম তাঁর লজ্জাস্থান ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

সুমাইয়া (রা) ঈমানের ঐশ্বর্য বুকে ধারণ করে শাহাদাত বরণ করেন।

☐ আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসির (রা)।

আব্বা আম্মার সাথে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম ত্যাগ করার নির্দেশ উপেক্ষা করায় আবু জাহল তাঁকে একটি লাঠি দিয়ে অনবরত পিটাতে থাকে।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত শরীর নিয়ে এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

☐ বিলাল ইবনু রাবাহ (রা)।

তিনি ছিলেন পাষণ্ড উমাইয়া ইবনু খালাফের একজন ক্রীতদাস।

ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়।

রাতের বেলা তাঁকে খুঁটির সাথে বেঁধে তাঁর সারা শরীরে চাবুক মারা হতো।

শরীরের চামড়া ফেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তো।

দিনের বেলা তাঁকে কা'বার চত্বরে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।

একদিন আবু জাহলের নির্দেশে তাঁকে উদোম করে গরম বালির ওপর শোয়ানো হয়।

পিঠে চাপানো হয় এক খণ্ড ভারি পাথর। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বড্ড কষ্ট হচ্ছিলো তাঁর। এমতাবস্থায় আবু জাহল নিকটে এসে বলে, 'বাঁচতে যদি চাস মুহাম্মাদের দল ত্যাগ কর।' এই কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে বিলাল ইবনু রাবাহ (রা) ক্ষীণ কণ্ঠে, 'আহাদ' 'আহাদ' উচ্চারণ করে তাঁর নিখাদ ঈমানের প্রমাণ পেশ করেন।

☐ উম্মু শুরাইক (রা)।

তিনি মুশরিকদের স্ত্রীদের কাছে চলে যেতেন।

তাদের সাথে আলাপ করতেন। মাঝে মধ্যে আল কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে তাদেরকে দীনের দা'ওয়াত দিতেন।

বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়।

তাঁর জন্যও সারাদিন রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।

রোদের প্রচণ্ডতায় দারুণ পিপাসায় কাতর হয়ে তিনি 'পানি' 'পানি' বলে চিৎকার করতেন। কিন্তু মুশরিক নেতাদের ভয়ে কেউ এক পেয়ালা পানি নিয়ে এগুতো না।

তৃতীয় দিন তাঁর অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। তিনি নির্বোধের মতো হয়ে যান।

ঐ সময় এক ব্যক্তি আকার ইংগিতে তাঁকে বুঝাতে চাইলো, 'তুমি যে এক আল্লাহর ওপর ঈমান নিয়ে বসে আছ, সেই জন্যই তো তোমার এই শাস্তি। তুমি যদি সেই চিন্তা থেকে সরে আস তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে।' লোকটি আকার ইংগিতে তাঁকে যা বুঝাতে চেয়েছে তিনি তা বুঝতে সক্ষম হন এবং চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তো এখনো সেই ঈমানের ওপরই অটল আছি।'



☐ লুবাইনা (রা)।

তিনি ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) ক্রীতদাসী।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তখনো ইসলামের কট্টর দুশমন।

তিনি ছিলেন খুবই বলবান পুরুষ।

তাঁর ক্রীতদাসী লুবাইনা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন বুঝতে পেরে তিনি তাঁকে চাপ দেন ইসলাম ত্যাগ করতে। কোন ফলোদয় হলো না।

এবার তিনি একটি চাবুক এনে লুবাইনাকে (রা) পিটাতে শুরু করেন।

অনেকক্ষণ পিটিয়ে তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে তিনি তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতে বলেন। লুবাইনা (রা) রাজি হলেন না। তাঁকে আবারো পিটানো হলো। এতেও উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) লক্ষ্য হাছিল হলো না।

বার বার পিটিয়ে উমার ইবনুল খাত্তার (রা) ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন এবং বলেন, 'লুবাইনা, তোকে পিটাবার শক্তি আর আমার গায়ে নেই।'

রক্তাক্ত ও বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে ঈমানের বলে বলীয়ান লুবাইনা (রা) বলে ওঠেন, 'আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন আল্লাহ আপনার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেবেন।'

☐ খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)।

তিনি ছিলেন উম্মু আন্মার নামক এক মহিলার ক্রীতদাস।

উম্মু আন্মারের একটি কারখানা ছিলো যেখানে লোহা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হতো। খাব্বাব (রা) ঐ কারখানায় কাজ করতেন।

তিনি ছিলেন প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন জানতে পেরে উম্মু আন্মার কয়েকজন পুরুষ সাথী নিয়ে কারখানায় আসে। ওরা বলে, 'তুমি নাকি ধর্মত্যাগী হয়েছো?'

দৃঢ় কণ্ঠে খাব্বাব (রা) বললেন, 'না, আমি ধর্মত্যাগী হইনি। আমি লা শারীক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি।'

তিনি যেনো ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়লেন। কিল, ঘুষি, লাথি ও লাঠি পেটা শুরু হয়। দারুণ আহত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে পদ দলিত করা হয়।

এরপর প্রতিদিনই তাঁকে শাস্তি দেয়া হতে থাকে। কখনো কখনো উম্মু আন্মার হাপরে লোহার পাত গরম করে তাঁর শরীরে সেঁকা দিতো। চামড়া পুড়ে যেতো। রক্ত গড়িয়ে পড়তো।

একদিন উম্মু আন্মার হাপরে কতগুলো পাথর খণ্ড গরম করে বিছিয়ে দেয়। তার নির্দেশে লোকেরা খাব্বাবকে (রা) উদোম করে সেই গরম পাথর খণ্ডগুলোর ওপর শুইয়ে দেয়। একজন লোক তাঁর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। গরম পাথরের উত্তাপে তাঁর পিঠের চামড়া পুড়ে যায়। রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে।

এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) ঈমানের ওপর অটল থাকেন। ঈমানের খাটিত্বের প্রমাণ পেশ করেন।

## ৪। আছহাবে রাসূল ছিলেন ত্যাগী মানুষ

দা'ওয়াতের কাজে, জিহাদের কাজে, অভাবী মানুষের প্রয়োজন পূরণে এবং জনহিতকর কাজে তাঁরা অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতেন।

☐ আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা)।

ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর সঞ্চয় ছিলো ৪০ হাজার দিরহাম। হিজরাতের সময় ছিলো মাত্র ৫ হাজার দিরহাম।

প্রধানত নও মুসলিমদের পুনর্বাসন ও নির্যাতিত দাস-দাসীদেরকে ক্রয় করে মুক্তির ব্যবস্থায় ব্যয় হয় এই অর্থ।

তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পদ এনে জমা দেন। পরিবারের সদস্যদের জন্য তিনি কিছুই রেখে আসেননি।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তাদের জন্য যথেষ্ট।"

☐ আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রা)।

তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে তিনিও সমুদয় সম্পদ এনে জমা দেন।

☐ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)।

তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে তাঁর সমুদয় সম্পদের ৫০ ভাগ জমা দেন।

☐ উসমান ইবনু আফফান (রা)।

আল মাদীনায় অনেকগুলো কূপ ছিলো। কিন্তু সুপেয় পানি পাওয়া যেতো শুধু রুমা কূপে। এক ইয়াহুদী ছিলো সেই কূপের মালিক। সে বিনা পয়সায় কাউকে এক গ্লাস পানি দিতোনা। উসমান ইবনু আফফান (রা) আঠার হাজার দিরহামের বিনিময়ে সেই ইয়াহুদী থেকে রুমা কূপ কিনে নিয়ে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

মুছাল্লীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মাসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। উসমান ইবনু আফফান (রা) পার্শ্ববর্তী জমি কিনে তা মাসজিদে নববীর জন্য ওয়াকফ করে দেন।

তিনি তাবুক অভিযানে ১০ হাজার মুজাহিদের বাহন ও যাবতীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেন।

☐ আবু তালহা যায়িদ ইবনু সাহল আল আনছারী (রা)।

"তোমরা প্রকৃত পুণ্য পেতে পারো না যেই পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় কর।" (আলে ইমরান: ৯২) এ আয়াত নাযিল হলে আবু তালহা ভাবতে থাকেন। তাঁর মন বলে ওঠে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু একটি বাগান। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট গিয়ে তিনি এটি দান করে দেয়ার ঘোষণা দেন।

☐ আবুদ্ দাহদাহ ছাবিত আল আনছারী (রা)।

"এমন কে আছে যে আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে যা তিনি বহু গুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবেন।" (আল হাদীস-১১) এ আয়াত নাযিল হলে তা নিয়ে ছাহাবীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা চলতে থাকে।



এ আয়াত আবুদ্ দাহদাহর (রা) নিকট পৌঁছলে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট গিয়ে তাঁর হাতে হাত রেখে বলেন, "আমি আমার বাগানটি আমার রবকে করযে হাসানা হিসেবে দিয়ে দিলাম।" সে বাগানে ছিলো ছয়শত খেজুর গাছ। গাছগুলোতে প্রচুর খেজুর ধরতো। সেগুলো বিক্রয় করে তিনি মোটা অংকের অর্থ লাভ করতেন। বাগানের একাংশে ছিলো তাঁর বসত বাড়ি।

ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন, "উম্মুদ দাহদাহ, আমি তো এই বাগানটি আমার রবকে করযে হাসানা হিসেবে দিয়ে এসেছি।"

যেমন স্বামী তেমন স্ত্রী। তিনি বললেন, "আপনি খুব লাভজনক ব্যবসাই করেছেন।"

☐ তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা)।

একবার হাদরামাউত থেকে ব্যবসার মুনাফা হিসেবে তাঁর হাতে আসে ৭০ হাজার দিরহাম। রাতে বিছানায় শুয়ে তিনি ছটফট করছিলেন।

স্ত্রীর প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন, "সেই সন্ধ্যা থেকে আমি ভাবছি, এতগুলো দিরহাম ঘরে রেখে ঘুমুলে একজন মানুষের তার রবের প্রতি কী ধারণা পোষণ করা হয়?" স্ত্রী তাঁকে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে সকাল বেলা সেইগুলো বিতরণের পরামর্শ দেন।

তিনি স্ত্রীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে রাত কাটান।

সকালে অনেকগুলো থলে সংগ্রহ করে দিরহামগুলো ভাগ করে কম বিত্তবান লোকদের মাঝে বিতরণ করে দেন।

☐ আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রা)।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পরবর্তী কোন এক সময়ের ঘটনা।

আল মাদীনায় হৈ চৈ পড়ে গেলো।

সাতশত উটের কাফিলা ঢুকছে শহরে।

প্রতিটি উটের পিঠে খাদ্যশস্য ভর্তি অনেকগুলো বস্তা।

আয়িশা আছিছদ্দিকা (রা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বাণিজ্য কাফিলা কার?" লোকটি জানালো যে, এটি আব্দুর রহমান ইবনু আউফের (রা)।

আয়িশা আছিছদ্দিকা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, "আমি যেন আব্দুর রহমান ইবনু আউফকে পুলছিরাতের ওপর একবার হেলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে উঠতে দেখলাম।"

সে ব্যক্তির মাধ্যমে কথাগুলো আব্দুর রহমান ইবনু আউফের (রা) কানে গেল।

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ইনশাআল্লাহ, আব্দুর রহমান সোজা হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

অতপর তাঁর নির্দেশে তাঁর কর্মচারিরা সাতশত উটের পিঠের বস্তাগুলো আল মাদীনার অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়।

এক বর্ণনা মতে, সাতশত উটও একইভাবে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিলো।

**৫। আছহাবে রাসূল ছিলেন অল্পে তুষ্ট মানুষ**

আছহাবে রাসূল ভোগবাদী ছিলেন না।

তাঁরা বিলাসী ছিলেন না।

তাঁদের চাহিদার তালিকা দীর্ঘ ছিলো না।

তাঁরা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

অল্পে তুষ্টি ছিলো তাঁদের জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

☐ আবু বাকর আছ ছিদ্দিক (রা)।

রাষ্ট্র প্রধান হয়েও তিনি বছরে মাত্র আড়াই হাজার দিরহাম ভাতা নিতেন।

বাইতুল মাল থেকে বছরে দুই সেট পোশাক পেতেন।

তিনি সাদামাটা জীবন যাপন করতেন।

☐ উমার উবনুল খাত্তাব (রা)।

রাষ্ট্র প্রধান হয়েও তিনি বছরে পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নিতেন।

তিনি সাদামাটা জীবন যাপন করতেন।

☐ উসমান ইবনু আফফান (রা)।

উসমান ইবনু আফফান (রা) একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন।

ব্যবসার মুনাফার একাংশ দিয়ে তিনি সংসার চালাতেন।

মুনাফার বাকি অংশ এবং বাইতুলমাল থেকে প্রাপ্ত ভাতা তিনি জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন।

তিনি তুলনামূলক ভালো খেতেন, ভালো পোশাক পরতেন। তবে বিলাসিতা করতেন না।

☐ আলী ইবনু আবী তালিব (রা)।

তিনি বছরে পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নিতেন।

তিনি সাদামাটা জীবন যাপন করতেন।

☐ আয্ যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)।

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের একজন।

ব্যবসার মুনাফার একাংশ দিয়ে তিনি সংসার চালাতেন।

মুনাফার বাকি অংশ এবং এক তাঁর মালিকানাধীন এক হাজার দাসের আয়কৃত সমুদয় অর্থ মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিতেন।

তিনি সাদামাটা জীবন যাপন করতেন।

☐ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা)।

তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, ঢাল, তলোয়ার এবং ঘোড়ার পিঠে তাঁর বসার আসন ঠিকঠাক পেলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন।

তিনি সাদামাটা জীবন যাপন করতেন।

☐ আবু যার আলগিফারী (রা)।

তিনি খুবই সাদামাটা জীবন যাপন করতেন।



একবার এক ব্যক্তি তাঁর বাসস্থানে এসে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার আসবাবপত্র কোথায়? তিনি বললেন, "আখিরাতে আমার একটি ঘর আছে। আমি আমার আসবাবপত্র সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

☐ সায়ীদ ইবনু আমের আল জুমাহী (রা)।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে হিম্স নামক স্থানে গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

একবার হিমস্ থেকে একদল লোক আল মাদীনায় এসে আমীরুল মুমিনীন উমার উবনুল খাত্তাবের (রা) সাথে সাক্ষাত করেন। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে উমার (রা) হিমসের অভাবী মানুষদের একটি তালিকা তৈরি করে তাঁকে দিতে বলেন। হিমস্ বাসীরা একস্থানে বসে মত বিনিময় করে একটি তালিকা তৈরি করে তা নিয়ে এসে উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) হাতে দেন। তালিকার প্রথমেই সায়ীদ ইবনু আমের নামটি দেখে আমীরুল মুমিনীন জিজ্ঞেস করেন, "এ কোন সায়ীদ"?

তাঁরা তাঁকে অবহিত করেন যে ইনি তাঁদের গভর্ণর।

তাঁরা জানান যে, কখনো কখনো এমনও দিন যায় যে তাঁর চুলার ওপর পাতিল বসেনা।

এই কথা শুনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কেঁদে দিলেন।

অতপর তিনি হিমসবাসী বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন অংকের অর্থ বরাদ্দ করেন।

সায়ীদ ইবনু আমেরের(রা) জন্য তিনি বরাদ্দ করেন ১ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)।

হিমসবাসীরা ফিরে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে তাদের অর্থ পৌঁছে গভর্ণরের কাছে এসে তাঁর থলেটি তাঁকে বুঝিয়ে দেন। থলের মুখ খুলে দীনারগুলো দেখেই সায়ীদ বলেন উঠেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

ভেতর থেকে স্ত্রী বলেন, "কি হয়েছে, আমীরুল মুমিনীন কি মারা গেছেন?"

সায়ীদ বললেন, "না, তার চেয়েও বড়ো কিছু।"

স্ত্রী বললেন, "মুসলিমদের ওপর কি কোন মুছীবাত আপতিত হয়েছে?"

সায়ীদ বললেন, "না, বরং তার চেয়েও বড়ো কিছু।"

স্ত্রী বললেন, "সেই বড়ো কিছুটা কী?"

সায়ীদ বললেন, "আমার আখিরাত বরবাদ করার জন্য দুনিয়া আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমার ঘরে বিপদ এসে পড়েছে।"

স্ত্রী বললেন, "বিপদটা দূর করে দিন।"

সায়ীদ বললেন, "এই ব্যাপারে তুমি কি আমাকে সহযোগিতা করবে?"

স্ত্রী বললেন, "অবশ্যই।"

অতঃপর সায়ীদ দীনারগুলো কতগুলো থলেতে বিভক্ত করে হিমসের অভাবী মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

আছহাবে রাসূল জীবন ধারনের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ হলেই পরিতৃপ্ত থাকতেন।

দুনিয়ার প্রতি তাঁরা ছিলেন নির্মোহ।

দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন বলেই তাঁরা অল্পে তুষ্ট মানুষের সর্বোচ্চ নমুনা হতে পেরেছিলেন। (ক্রমশ...)

ইমেইল: info@bicdhaka.com

# বিভাজিত মানব: তুমি কতটা কার?

ফজলে এলাহি মুজাহিদ

গলা উঁচু করে অনেকেই ঘোষণা দিয়ে থাকি- আমি মুসলিম অথবা খৃষ্টান, ইয়াহূদী, হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা সাম্যবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী অথবা আরো আরো। ঘোষণা রেখে অন্ততপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোন পন্থীকেও যদি বলা হয়- তুমি পুরোপুরি তা নও; অন্তহীন ক্ষিপ্ততা দেখতে যে হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। চাই সে তার গ্রহণ করা ধর্ম, মতবাদ কিংবা জীবন পদ্ধতির মানে বুঝুক বা না বুঝুক, বিস্তারিত জানুক বা না জানুক, মেনে চলুক বা না চলুক। পরিচয় মানব ললাটে শোভিত এমনি এক উজ্জ্বল তাজ, মানুষ নিঃশেষ হয়ে যেতে প্রস্তুত কিন্তু তাজকে ধুলিস্মাৎ হতে দিতে চায় না কেউই। আবার ব্যক্তি যা গ্রহণ করেছে তার অসারতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাই তার নিকট সর্বোচ্চ সঠিক ভূষণ পায়। এই 'অসারতা প্রমাণ' ব্যাপারটিও নিতান্ত নগণ্য সংখ্যকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে এবং ব্যক্তির নিকট তার গৃহীত পদ্ধতির বাইরের সকল কিছুই ভ্রান্ত ঠেকে। কিন্তু প্রকৃত বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ কিংবা বর্জন করাটাই বিবেকের ধারক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয়। আসুন একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক-

মানুষের প্রকাশ সাধারণতঃ দুই প্রকার- আভ্যান্তরীণ এবং বাহ্যিক।

**আভ্যান্তরীণ:** তথ্য তা ইন্দ্রিয়সমূহ কিংবা অন্তর্গত অন্যান্য যে কোন মাধ্যম থেকেই আসুক না কেন, মানুষ নিজের ভেতর তার কিছু প্রক্রিয়া ঘটায়। আর এতে তাকে সাহায্য করে থাকে তার মস্তিষ্ক, তার মন অথবা মনের বিভিন্ন দিক এবং অবশ্যই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে তার আত্মা। আভ্যান্তরীণ এই প্রকাশ ব্যক্তি পুরোটা বাহিরের জগতকে জানায় না, সম্পূর্ণটা জানানো উচিতও নয় আবার অন্যদের জানা সম্ভবও নয়; বরং যতটুকু বাইরে ছড়ানো অনিবার্য হয় অথবা বাধ্য হয় অথবা অস্থির ব্যক্তিত্বের কারণে অজান্তেই ছড়িয়ে দেয় ততটুকুই প্রকাশ হয় এবং তা নির্ভর করছে ব্যক্তির নিজস্ব পর্যায়ের উপর। কিন্তু নিজের মধ্যে যে সম্পূর্ণটুকু ছড়াতে হয় কিংবা ফুলে-ফলে শোভিত হয় তা ভাল-মন্দ যেমনি হোক; তাতে কোন কৃপণতার অবকাশ নেই।

**বাহ্যিক:** আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ফলাফলই মূলত বাহ্যিক কর্মকাণ্ড। এই প্রক্রিয়া কখনো সূত্রিত হয় দীর্ঘ সময় ধরে আবার কখনো এই সিদ্ধান্ত অন্তর-মস্তিষ্ককে দিতে হয় সেকেণ্ডেরও কয়েক ভগ্নাংশের ভেতর। আভ্যান্তরীণ সিদ্ধান্তের বাইরে ব্যক্তি কখনোই কিছু করে না চাই তা তার পছন্দ হোক বা বাধ্য হয়ে করুক, নিজে ভুল সিদ্ধান্ত নিক কিংবা প্রতারণামূলক বিপরীত কিছুই করুক। তো এই দুই অংশের সমন্বয়ে আমরা নিজেদের জীবনের জন্য কতটা কি গ্রহণ করেছি তা একটু খতিয়ে দেখা যাক-



ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব দু'টি পর্যায়-আভ্যান্তরীণ ও বাহ্যিক-নিয়ে আবার মোটামুটি চার পর্যায়ে সে ভূমিকা রাখতে পারে। সেগুলো যথাক্রমে- ১) ব্যক্তিগত, ২) পারিবারিক, ৩) সামাজিক ও ৪) রাষ্ট্রীয়।

**ব্যক্তিগত:** এ পর্যায়ে তার একান্ত ব্যাপারগুলো থাকে, তার অনেক গুলোই কেউ কোনদিন জানতে পারে না আবার অনেকগুলো তাকে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হয়।

**পারিবারিক:** সৃষ্টির আদি থেকেই এই প্রতিষ্ঠান মানুষের সাথে একান্তভাবে জড়িত, কেননা মানুষের বিকাশ সাধন স্রষ্টা অন্য মানুষ থেকেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যকার সম্পর্ক অনস্বীকার্য। অবশ্য পরিবারের রূপভেদে যুগে যুগে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। কেউ যদি এই পরিবার প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে গবেষণা করতে চায় তো সে অবশ্যই কিছু মানুষকে পাবে যারা কোন না কোনভাবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তথাপি তারাও নিজেদের মধ্যে একটা পছন্দ-অপছন্দের ঐক্য তৈরী করে নিয়েছে; বিচ্ছিন্ন থাকেনি।

**সামাজিক:** মানুষের জন্য সামাজিক জীবন যাপন করাটা তার অস্তিত্বের জন্যই অনিবার্য। পরস্পর নির্ভরশীলতায় মানুষ সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল এবং মানুষের যাবতীয় উন্নয়ণ হয়ে থাকে সম্মিলিত, একক নয় কখনোই; বরং হোক না দু'জন মাত্র, তারপর এ দু'জনই গড়ে তুলতে পারে একটি সভ্যতা।

**রাষ্ট্রীয়:** এই পর্যায়টিও যুগের সাথে সাথে এবং অঞ্চল ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বার বার তার রূপ পাল্টিয়েছে। কখনো কোথাও ছিল পারিবারিক শাসন, গোত্র ভিত্তিক শাসন, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রের সমন্বয়ে জমিদারী কিংবা অধিকৃত এলাকা জুড়ে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা, আধুনিক রূপায়নে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত প্রায় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই বর্তমান রূপ। ব্যক্তি এই ব্যবস্থায় তার নিজের ভূমিকা রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক ভূমিকা মূলত কোন ব্যক্তির নয়; বরং তা রাষ্ট্রের। আধুনিক পর্যায়ক্রমিক উন্নতির ফলে বিশ্বায়নের যে ডাক উঠছে, যদি তা কখনো বাস্তবায়িত হয় তখন হয়ত এই ব্যক্তিকেই 'বিশ্বরাষ্ট্র'-এর একক ধরা হতে পারে।

এবার আসা যাক এই বিভাজনগুলোয় আমরা কতটা ভূমিকা রাখছি এবং এসব ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে ভূমিকা রাখার জন্য কিংবা নিজ নিজ জীবনকে পরিচালনার জন্য আমরা কার কাছ থেকে কি পাচ্ছি অথবা কি কি আমাদেরকে অন্যের কাছ থেকে ধার করতে হচ্ছে অথবা এমন কোন ব্যবস্থা কি আছে যার কাছ থেকে আমরা সম্পূর্ণ জীবনের দিকনির্দেশনা পাবো?

**ইয়াহূদী-খৃষ্ট ধর্ম:** বলতে দ্বিধা করেন না যে পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতেই রয়েছি। কিন্তু ত্রিত্ববাদ কি ইব্রাহীমের ('আলাইহিস্ সালাম) আনীত ছিল? অথবা আল্লাহর পুত্র-কন্যা সাব্যস্তকরণ? এছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সম্পর্কে মূসা ও ঈসা 'আলাইহিমাস সালাম তার প্রভুর নিকট হতে বহু বাণী নিয়ে এসেছিলেন যা তাওরাত ও ইঞ্জিলে ছিল। তখনকার সময়ের জন্য সেটাই ছিল যথার্থ বিধান। কিন্তু মরহুম আহমাদ

দিদাত প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন যে, বতর্মান বাইবেলে আল্লাহর কোন বাণী অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান নেই; খৃষ্টান জগত সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জয়ী হতে পারেননি। পরন্তু রাষ্ট্রের জন্য সেসব ধর্মে কোন সংবিধান নেই; বরং তাদের আলেম সমাজের প্রভাব কোন রাষ্ট্রে সুস্পষ্ট হলে কিংবা কোন দেশ অর্জনে ধর্মের শ্লোগান উচ্চকিত হলেই তাকে ধরে নেয়া হয় খৃস্ট রাষ্ট্র অথবা ইয়াহুদী রাষ্ট্র। তাহলে এ পর্যায়ে একজন মানুষকে জীবনের ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যন্ত অনেক কিছুই অন্যের কাছ থেকে ধার করে নিতে হয়। কখনো কখনো কোন কোন পর্যায়ের প্রায় সম্পূর্নটুকুই।

**হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য:** এসব ধর্মের ক্ষেত্রেও কোথাও পরিলক্ষিত হয় কিছু যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী, যেখানে অবতারগণ কিংবা খোদ প্রভুগণই পরস্পরের মধ্যে বিগ্রহে লিপ্ত, এমনকি স্বর্গেও লড়াই চলে। আবার কোথাও কিছু বাণী, ধ্যান, আধ্যাত্মিকতার বিবিধ প্রক্রিয়া এবং পূজা পার্বনই ধর্মের সবকিছু। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে সমাজ থেকে বের করে সন্ন্যাসব্রতী করে তোলে। সুতরাং সেসব থেকে ব্যক্তির একান্ত মানবীয় প্রয়োজনের দিকনির্দেশনা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিধান এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধান আশা করার আদৌ কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বাস্তবে মূলত তাদেরকে আরো বেশী পরিমাণ ধার করা জীবন পদ্ধতির উপরই নির্ভর করতে হয়।

**সাম্যবাদ:** ধর্মের পর মতবাদগুলোর দিকে তাকালে সেখানে আরো করুণ অবস্থা পরিলক্ষিত হবে। কেউ বললো যে, সে সাম্যবাদী। তাহলে সে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমতার জন্য তার জীবনপাত করছে। কিন্তু জীবনটা কিভাবে, কোন্ পন্থায়, কোন্ পদ্ধতিতে চালাচ্ছে তা তার জানা নাই; এমনকি রাষ্ট্রের অন্যান্য যাবতীয় বিধানাবলীর জন্যও তার একক কোন 'কথা' নেই। তাই সে পুরোপুরি সাম্যবাদী নয়; বরং সে তার বাহ্যিক প্রকাশে জানা-অজানায় মুসলিম বিধান থেকে যতটা মেনে চলছে ততটুকু মুসলিম, ইয়াহূদী-খৃষ্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম থেকে যতটা মানছে ততটুকু সেসবের অন্তর্ভুক্ত এবং তা তার জীবনের সার্বিক পর্যায়গুলোতেই বিস্তৃত।

**ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ:** কেউ বললো যে, সে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। যে যাই বলুক, এর দ্বারা মূলত দু'টি পর্যায় সাব্যস্ত হয়- হয় সে কোন ধর্মেরই অনুসারী নয় অথবা সম্ভাব্য সকল ধর্ম হতেই একটু একটু করেই মেনে চলছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে যারা বলে "যার যার ধর্ম তার তার কাছে", তারা নিতান্ত বিভ্রান্ত করার জন্যই এমন কথা বলে থাকে। কেননা, একথা বলার জন্য কাউকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হয় না প্রত্যেক ধর্মের লোকেরাই এমন একটা সাধারণ ধারণা কোন না কোনভাবে পোষণ করেই। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু কৌশলে ধর্মকে কোণঠাসা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার্জনের জন্য একটা প্রতারণা ব্যতীত আর কিছু নয়। ব্যক্তিকে জগাখিচুড়ী হোক আর এককভাবে হোক কোন না কোন ধর্মীয় বিধান



অথবা সম্মিলিত বিধানের আওতায় আসতেই হয় জীবনের ব্যাপকতায়।

**ইসলাম:** এবার আসা যাক ইসলামের ক্ষেত্রে, কেউ বললো- আমি মুসলিম। এখানেও একই ব্যাপার অনস্বীকার্য, দাবীটাই সবকিছু নয়; কাজেই তার প্রমাণ। আগেই বলেছি যে, ব্যক্তির বাহ্যিক প্রকাশ অবশ্যই আভ্যান্তরীণ সিদ্ধান্ত। তাই মুসলিম দাবীদার হয়েও যদি ব্যক্তিজীবনের কিছু অংশে হিন্দু বিশ্বাস ও কাজ, কিছু অংশে খৃষ্টান, কিছু অংশে সাম্যবাদী নৃশংসতা, কিছু অংশে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতারণার অনুসারী হয়, তবে অবশ্যই সে আনুপাতিক হারে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের অনুসারী, বলার ক্ষেত্রে সে যতই উচ্চকণ্ঠ মুসলিম হোক না কেন। মূলত সে ততটুকুই মুসলিম ইসলামের যতটুকু সীমানায় সে তার আভ্যান্তরীণ ও বাহ্যিক প্রকাশে রয়েছে। এই বিচারে প্রত্যেকে নিজেই বলতে পারবে যে, সে কতটুকু মুসলিম। তবে আকীদা-বিশ্বাসে তথা আভ্যান্তরীণ প্রকাশে যদি কেউ মুনাফেকী থেকে বেঁচে থেকে আন্তরিকভাবে মুসলিম থাকে তারপর যদি বাহ্যিকতায় সৎকর্ম কমও হয়, তথাপি আশা করা যায় যে আল্লাহর দফতরে তিনি মুসলিম হিসেবেই থাকবেন এবং আখেরাতে হয় পাপের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদী শাস্তি ভোগ করবেন অথবা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

দেখার বিষয় যে, ইসলাম কি তাহলে কোন ব্যক্তিকে তার পরিপূর্ণ জীবন চালানোর মত দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম?

জবাব- অবশ্যই সক্ষম। "মানব জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন কোন প্রশ্ন নাই যার জবাব ইসলাম দিতে অক্ষম।" নিতান্ত নগন্য হাত ধোয়া, পথচলা, দৃষ্টির নাড়াচাড়া থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় বিধানে অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক নীতি ইত্যকার কোন্ বিষয়টি আলোচিত হয়নি ইসলামে? আল্লাহ সোবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন: ((আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ।)) [সূরা আন্-নাহল: ৮৯] শুধু মাত্র এই ঘোষণাই যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং একজন রাসূল তার জীবনের তেইশ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যাবতীয় বিধানের বাস্তবায়ন করে এও প্রমাণ করে গেছেন যে, ইসলামের বিধান মানুষের জন্যই এবং মানুষের পক্ষে তা মেনে চলা সম্ভব।

প্রতিজন মানুষের বিবেচনা করা উচিত কিভাবে তার জীবনটাকে সে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করবে? খোঁজা উচিত কোথায় সে পরিপূর্ণ জীবনের জন্য একটা সুস্পষ্ট বিধান ও দিকনির্দেশনা পাবে? অধ্যয়ন-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত স্বার্থের অন্যান্য দিকের মত গোটা জীবনের ক্ষেত্রেও, যেন সবচেয়ে সুন্দর ও সফল জীবন পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আসুন আমরা সকলে নিজেদের বিচার নিজেরাই করি! নিজেদের হিসাব নিজেরাই করি! সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বন্ধুত্ব চলবে না, কেনা বেচা চলবে না!

ইমেইল: efaz77@gmail.com

# আবীর

আতাউর রহমান সিকদার

রাশেদ আর রুবেলের প্রতিদিন একসাথে স্কুলে যাওয়া আসা আর গলায় গলায় ভাব দেখে লোকেরা ভাবতো এরা দু'ভাই কিংবা মামা ভাগনে হবে হয়ত। একই গ্রামে ছিল দু'জনের বাড়ী। রাশেদের পিতা ছিলেন স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার। তবে জীবিকার প্রধান উৎস ছিল কৃষি এবং তাঁতশিল্পে। মাষ্টারী ছিল মানবসেবার জন্যে। কাজকর্মে তারই প্রমাণ মিলত। রুবেলের পিতা ছিলেন উপজেলার সাবজজ। বাড়ী থেকে স্কুল ছিল প্রায় দেড় মাইল দূরে। সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাওয়ার সখ মাঝে মধ্যে জাগলেও বাধা হয়ে দাঁড়াত একটি বাঁশের সাঁকো। তাই হাঁটা ছাড়া দ্বিতীয় কোন সহজ পথ তাদের সামনে খোলা ছিল না। তাদের বন্ধুত্বও এমন পর্যায়ে ছিল যে, একজন কোন কারণে স্কুল ফাঁকি দিলে অন্যজনও তাই করতো। কিন্তু সেসব কথা আজ তাদের স্মরণ আছে বলে মনে হয় না। কেন মনে হয় না সেকথায় পরে আসছি। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, স্কুল থেকে কলেজ, অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও তারা একই বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করছে এবং ছাত্রাবাসে সিটও পেয়েছে একই হলে একই রুমে।

মানবশিশু ইসলামের ফিতরাতের উপর জন্ম নিলেও শিক্ষা কিংবা পরিবেশ যে তাকে অনৈসলামী বানিয়ে দেয় রুবেল এর এক বৎসরের ইউনিভার্সিটি জীবনই তার প্রমাণ। তবে রাশেদ রয়েছে ঠিক আগেরই মত। বস্তুবাদের হাতছানি তাকে কাছে টানতে পারেনি। হতে পারে এটা তার পিতারই পূণ্য এবং দো'আর ফল।

আজ একটা নোট তৈরী করতে গিয়ে ডাইনিং এ যেতে দেরী হয়েছে রাশেদের। সাধারণতঃ এশার নামাজের পর পরই খাওয়া তার অভ্যাস। রুমে বসেই নোটটা তৈরী করছিল সে। হঠাৎ রুবেল বাইরে থেকে এসে রুমে ঢুকল। সাথে জসিম উদ্দিন হলের আবাসিক ছাত্র সাগর। সাগর একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের লীডার। সাগরকে দেখে ভেতরটা আঁৎকে উঠল রাশেদের। সাগরের দলের কোন মিটিং কিংবা মিছিল যেদিন থাকে, ছাত্র ছাত্রীরা সেদিন পালিয়ে বেড়ায়। কারণ, সাগরের সামনে পড়লে মিটিং বা মিছিলে যেতে হবে। না গেলে হোষ্টেলের সীটটা ঘিরে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হবে, অতঃপর সে জালের উপর ডানা মেলে বসবে নখরওয়ালা কালো শকুন।

পাঁচ দিন পর ছাত্র সংসদ নির্বাচন। সাগরদের দৌড় ঝাঁপ, আন্দোলন, ক্যানভাসিং দেখে মনে হচ্ছে এ নির্বাচনের সাথে তাদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। যে কোন মুল্যে এ নির্বাচনে তাদের জিততেই হবে।

নোটের কাজটা আপাততঃ স্থগিত রেখে ডাইনিং-এর দিকে যাবার চিন্তা করেও আবার নোট তৈরীতেই মন দিল রাশেদ, কারণ এখন ডাইনিংএ কোন সীটই হয়ত খালি নেই, খেতে



বসে যাওয়া ছাত্রদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

বইয়ের পাতায় নজর রেখেও রাশেদ অনুভব করল, সাগর এবং রুবেল ইশারা ইংগিতে কি যেন কথাবার্তা বলছে।

রাশেদ ভেবে পাচ্ছেনা যে রুবেল তার এত আপন ছিল সে হঠাৎ এভাবে বদলে গেল কেন! রুবেলের অধঃপতন চিন্তা করে শিউরে উঠল সে। কোন অনুগ্রহ সে রুবেলের নিকট চায় না। এতটুকু চায় যে, রুবেল এ পথ থেকে ফিরে আসুক।

চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল রাশেদ।

রাশেদকে অবাক করে দিয়ে সাগর বলে উঠল:

: রাশেদ কি বাইরে যাচ্ছ?

: হ্যাঁ

: ভুলোনা যেন, তোমার ভোটটা আমাদের নিপা-রুবেল পরিষদে চাই।

রাশেদ কিছুটা অবাক, কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল: এটা কি আপনার আবেদন নাকি নির্দেশ?

মৃদু হেসে বলল রাশেদ: নির্দেশও বলতে পার। তাছাড়া তুমি যখন হোষ্টেলে থাক। তোমার জানা থাকা ভাল যে, হোষ্টেলের সিটগুলো আমরাই ম্যানেজ করে থাকি।

: আমি কি আমার ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারে কিছু কথা বলতে পারি?

: কি বলবে বলো।

: ভোট একটি গুরুত্বপুর্ণ আমানত। এর ভুল প্রয়োগের কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংসের কবলে পতিত হয়। এ ভোটের কারণেই নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে। নেতৃত্ব যেন এক মোটরযান-চালক। মোটর যানের আরোহীরা যেমন ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় সেদিকেই যেতে বাধ্য হয় যেদিকে চালক নিয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ নেতাও তার সমাজ বা রাষ্ট্রকে সে পথেই নিয়ে যায় যেদিকে সে চায়। নেতৃত্বের অধঃপতনের কারণে পলাশীর প্রান্তরে যে ট্রাজেডির সূচনা হয়েছিল তা নিয়ে আমরা উপন্যাস লিখি, বক্তৃতা দেই কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করিনা.....। মাফ করবেন, আমি অনেক কথা বলে ফেললাম।

: তোমার নীতিকথা কি শেষ?

সাগরের আক্রমণাত্মক কথায় কান না দিয়ে বিনয় বজায় রেখেই রাশেদ বলল: তাই সংগত কারণেই আমার ভোটটি প্রদানের পূর্বে আমি প্রার্থীর চরিত্র ও আল্লাহভীতি দেখতে চাই।

: বেশ! তোমার বক্তব্যের সাথে আমরা একমত। রুবেল তো তোমার সাথেই থাকে। ওর চরিত্র নিয়ে কি তোমার কোন সন্দেহ আছে?

সাগরের কথা শেষ না হতেই রুবেলের মোবাইল ফোনটি বেজে উঠে।

: জী হ্যাঁ, আমি কাষ্টমসে লোক পাঠিয়েছি- বলেই সাগরের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বাইরে চলে গেল রুবেল। রাশেদ লক্ষ্য করল, কাষ্টমস্ কথাটা বলতে গিয়ে কেমন যেন ঘাবড়ে

গেল রুবেল। হয়তো রাশেদের সামনে এ তথ্য সে প্রকাশ করতে চায়নি।

"ওর চরিত্র নিয়ে কি তোমার কোন সন্দেহ আছে?" -সাগরের কথাটি কানে বাজছে রাশেদের। রুবেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দু'মাস পরই রাশেদকে বলেছিল, রাশেদ, আব্বার পাঠানো টাকায় আমার চলছে না, আমার জন্যে একটি টিউশনী দেখ . . .।

সে রুবেল আজ ছ'মাসের ব্যবধানে লেটেষ্ট মডেলের ইয়ামাহা মোটর সাইকেল হাঁকায়। অত্যাধুনিক মোবাইল ফোন। ডানহীল সিগারেট। আরও একটি জিনিস সে গত সপ্তাহে রুবেলের নিকট দেখেছে। বিকাল থেকেই সেদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। গরমের কারণে জানালা খোলা রেখেই ঘুমিয়েছিল রাশেদ এবং রুবেল। মধ্যরাতে জানালার সটান শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় রাশেদের। দমকা বাতাস বইছে। বাতাসেরই তোড়ে রুবেলের পাশের জানালাটি একবার বন্ধ হচ্ছে আবার খুলছে, ঝির ঝির করে বৃষ্টির পানিও ঢুকছে রুবেলের পাশের জানালা দিয়ে। বৃষ্টি বেশী হলে রুবেলের বইপত্র, কাপড়চোপড় ভিজবে। রুবেল অঘোরে ঘুমুচ্ছে। রাশেদ ইতঃস্তত করছে, যাবে কি রুবেলের বিছানার পাশে জানালাটা বন্ধ করতে? কিন্তু... রুবেল যদি ভুল বোঝে! ইদানিং সম্পর্কের যে টানাপোড়েন চলছে। শেষটায় রাশেদের দয়াপ্রবণ মনটাই জয়ী হল। পা টিপে টিপে জানালা বন্ধ করে যেই ফিরতে যাবে অমনি জিনিসটা চোখে পড়ল তার। একটি পিস্তল। বালিশের নীচে ছিল। বালিস খানিকটা সরে আসার কারণে পিস্তলটির অর্ধেকটা বেরিয়ে এসেছে।

সে রাতে আর ঘুম আসেনি রাশেদের। পিস্তল দিয়ে কি করে রুবেল? মোটর সাইকেল, মোবাইল সেট- এসব কোথায় পেল সে? কাস্টমস এ কি তার কাজ?

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ল রাশেদের। রাত ১০টা বাজে। ক্ষুধার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। ডাইনিং হলের দিকে দ্রুত হাঁটা দিল রাশেদ। ইদানিং ডাইনিং-এ দেরীতে গেলেও আরেক সমস্যা। হয়ত দেখা যাবে ডাল ফুরিয়ে গেছে কিংবা তরকারী ঝোলশূন্য।

ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করেছে নিপা-রুবেল পরিষদ। মারামারি হওয়ার আশংকায় নির্বাচনের দিন প্রায় অর্ধেক ছাত্র ছাত্রী ভার্সিটিমুখো হয়নি। বলা যায় ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে নিপা-রুবেলরা।

আজ রুবেলদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হিসেবে ভিসির আসার কথা থাকলেও অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি। এসেছেন তাদের বিভাগের ডীন। প্রধান বক্তার তালিকায় রয়েছে ভাবী জি,এস রুবেলের নাম। মানিক চৌধুরী রুবেল। বক্তৃতায় রুবেল ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা ও সেসবের নানাবিধ পরিকল্পনা পেশ করে ভবিষ্যত রাজনীতির দিকনির্দেশনাও প্রদান করল। এক পর্যায়ে বলল: "আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশ ও জাতির কল্যাণের কথা ভোলেনি। বস্তুতঃ ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ চিন্তায় যারা মনোযোগী ছিল এবং



আছে আপনারা তাদেরকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন। এটা আপনাদের ন্যায়-নিষ্ঠা এবং সমাজ সচেনতারই পরিচায়ক। আমি আবারও এজন্যে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রিয় সহপাঠী ও সহপাঠীনিগণ, আজ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে তারাই একদিন দেশের কর্ণধার হবে। জাতি তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। সুতরাং আগামী দিনগুলোতেও আপনারা একই চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটাবেন এ আশা আমরা করছি। ঘুষ, দুর্নীতি ও চোরাচালানী আমাদের সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এসব প্রতিরোধের শপথ গ্রহণ করি।"

অদূরে দাঁড়িয়ে রুবেলের বক্তৃতা শুনছে রাশেদ। তার বাল্যকালের বন্ধু রুবেল কেমন বক্তৃতা করে সে কৌতুহল নিয়েই রাশেদ এখানে এসেছিল। বক্তৃতা শুনে রাশেদ দো'আ করল: "আল্লাহ! রুবেলকে তুমি হেদায়াত দাও, তাকে বাঁকা পথ থেকে সোজা সরল পথটিকে আলাদা করার তাওফিক দান করো।"

রাত ১২টা। জসিম উদ্দীন হলের তৃতীয় তলা। সাগরের রুমে গোপন মিটিং চলছে। মিটিংএ সাগর, রুবেল এবং নেতৃপর্যায়ের কতিপয় ছাত্র ছাড়াও আরো রয়েছেন তাদের মূল রাজনৈতিক দলের একজন নেতা। আলোচনা হচ্ছে রাশেদকে নিয়ে। রাশেদ তাদের পক্ষে কাজ করেনি। সাগর নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচনের দিন রাশেদ যেন সকাল ৭টায় এসে সাগরের সাথে দেখা করে, কিন্তু সে আসেনি। এর আগের দিন সাগর তাকে নিপা-রুবেল পরিষদের লিফলেট বিলি করতে দিয়েছিল কিন্তু রাশেদ অপারগতা প্রকাশ করেছে। এসব কারণে তারা রাশেদের উপর দারুণ ক্রুদ্ধ। সাগর রাশেদের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়ছে। নেতা এবার ধীরে ধীরে মুখ খুললেন, সকলেই নিঃশ্চুপ হয়ে নেতার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি বললেন: রুবেল, তোমার রুমে আমাদের আদর্শ ও চেতনা বিরোধী লোকের সিট থাকবে, এটা যে আমরা ভাবতেই পারছি না।

রুবেল আমতা আমতা করে বলল: এটা আমারই দুর্বলতা স্যার, যেহেতু ছোটবেলায় আমরা একসাথে পড়াশুনা করেছিলাম। তবে এখন আমি আপনার যে কোন নির্দেশ মানতে প্রস্তুত।

গোপন মিটিংয়ের এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। হোষ্টেল বাউন্ডারীর ভেতরে কোথাও ফজরের নামাজ হয় না বলে বাইরে পিলখানা মাসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করে রাশেদ, অতঃপর সেখানেই আধ ঘন্টার মত বসে কুরআনের তাফসীর পড়ে সে। প্রতিদিনের মত আজও ফজর পড়তে মাসজিদে গিয়েছিল রাশেদ। নামাজ এবং কুরআন পড়া মিলে প্রায় এক ঘন্টা সময় সে বাইরে ছিল। এ সময়টির মধ্যেই অপকর্মটি করা হয়েছে। তার মূল্যবান বইপত্র, কাপড়চোপড়, বিছানা বালিশ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তাতে আগুন ধরানো হয়েছে। সবকিছু পুড়ে নিঃশেষ হবার পর পানি ঢেলে আবার আগুন নিভিয়েও রাখা হয়েছে। রুমে রুবেল ছিল না। তার বদলে অন্য একজন রাতে এসে ঘুমিয়েছিল। রুবেলই রাত

৯ টার দিকে এসে এ লোককে রেখে যায়। কেন রুবেলের বদলে এ লোক এখানে ঘুমাল তা জানেনা রাশেদ, আর জেনেও লাভ নেই। রুবেলের কারণে ইদানিং রাশেদের মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। সে চাইছিল রুবেল এখান থেকে অন্য কোন রুমে শিফট না হলে সে নিজেই হল ছেড়ে দেবে।

অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল রাশেদের দু'টি চোখ। দীর্ঘ দু'সপ্তাহ পরিশ্রম করে যে নোটগুলো সে তৈরী করেছে, সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

প্রায় ৯ বছর পরের কথা। রাশেদ এখন শহীদ তিতুমীর কলেজের অধ্যাপক। এম এ ফাস্ট ক্লাস পাবার পর প্রায় সাথে সাথেই চাকুরী মিলে যায় তার। ভার্সিটি হোষ্টেলের সেই ঘটনার পর আর হোষ্টেলে থাকেনি রাশেদ। লালবাগে একটি মেসে থেকে ভার্সিটির বাকী জীবন শেষ করেছে সে। লালবাগ থেকে ভার্সিটির সমাজকল্যাণ বিল্ডিং ছিল প্রায় ৩০ মিনিটের পথ। প্রায় ৪ বছর মেস থেকে হেঁটে ভার্সিটিতে আসা যাওয়া করেছে সে। রাশেদের এ ৪টি বছর ছিল বেশ কষ্টের। কুরআন প্রেমিকদের সাথী যদি সে না হতো তাহলে হয়তো পড়াশোনাই ক্ষান্ত হতো তার। পূণ্যবান পিতার উপদেশ এবং উৎসাহও ছিল তার জন্য এক বিরাট অবলম্বন।

ভার্সিটিতে তার উপর অবিচারের কোন প্রতিকারও পায়নি সে। পাওয়ার কথাও নয়। কারণ রাশেদদের অবস্থা তখন ফেরাউনের রাজ্যে বনী ইসরাঈলদের মত। সে ঘটনার পরের দিন খবরটি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়। তবে একটি পত্রিকার খবর ছিল অবাক করার মত। পত্রিকাটি লিখেছে: "ছাত্র ছাত্রীদের নিশ্চিত ধারনা, নিপা-রুবেল পরিষদের বিজয় সহ্য করতে না পেরে তাদেরকে ফাঁসানোর জন্যে রাশেদ তার দলবল নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নিজেই নিজের সীটে ও বইপুস্তকে অগ্নিসংযোগ করেছে.....।"

মাযলুমের সাথে আল্লাহ থাকেন। হয় তাৎক্ষণিক ভাবে কিংবা সময়ান্তরে যুলমের বিনিময় আল্লাহ্ নিজ হাতে দেন, কোনটা দুনিয়াতে, আবার কোনটা আখেরাতে। আবার কখনো দুনিয়া, আখিরাত উভয় জগতেই দেন। রাশেদ হয়ত তার স্ত্রী আবীরের মাধ্যমে দুনিয়ার অংশও কিছু পেয়েছে। অর্থাৎ একজন পূণ্যবতী পতিপ্রাণা স্ত্রী।

এখানে আবীর এর কিছু পরিচয় প্রদান আবশ্যক।

আবীরের শিক্ষাজীবন শুরু সৌদী আরবে। সেটি ১৯৮২ সালের কথা। তার পিতা রিয়াদের একটা ইংলিশ স্কুলে তখন শিক্ষকতা করতেন। আবীর রিয়াদেই ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। একদিকে সৌদী আরবের পরিবেশ অন্যদিকে আল্লাহভীরু পিতামাতার সাহচর্য পেয়ে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে বড় হয় আবীর। তার পিতা একদিন তাকে এক মহিলা তাবেয়ীর জীবন কথা পড়ে শোনান। যার একাংশ ছিল এরূপ:

'তাবেয়ীকে প্রশ্ন করা হল- সম্মানিতা বোন, ৫০ বছর বয়সেও আপনার চেহারা ঠিক আঠার



বছরের যুবতীর মত, আপনি আপনার চেহারায় কি প্রসাধনী ব্যবহার করেন?

: তাকওয়ার তৈল।

: বুঝলাম না।

: অর্থাৎ বালেগা হওয়ার পর থেকে আমি আমার চেহারাকে পরপুরুষের সামনে উন্মোচন করিনি কখনো।

: আপনার চোখজোড়াও মনোহারী, তাতে নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবহার করেন!

: তাতে ব্যবহার করি নামাজের সুরমা।

: আর ঠোঁটে?

: আল্লাহর নাম।'

তন্ময় হয়ে শুনছে আবীর। কিশোরী মনে তার ভেসে বেড়াচ্ছে কল্পিত সেই তাবেয়ীর ছবি। আবীরের আম্মাও তখন পাশেই বসা। গল্প শেষ হলে তিনি আবীরের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন: আমাদের আবীরও সেরকম হবে গো।

নীরবতা ভেঙ্গে হঠাৎ আবীরই প্রশ্ন করল: আব্বু, আমাদের স্কুলের হেড মিস্ট্রেস বলেছেন, সব প্রসাধনীই চামড়ার জন্যে ক্ষতিকর। চেহারার চামড়া কালচে বিদঘুটে হয়ে গেছে বা পুড়ে গেছে এমন পঁয়ত্রিশোর্ধ মহিলাদের উপর এক জরিপ চালিয়ে নাকি দেখা গেছে, তারা প্রায় কৈশোরকালীন সময় থেকে প্রতিদিন প্রসাধনী ব্যবহার করতো। আসলে কি ঘটনাটি সত্য?

: হ্যাঁ, সত্য। সবধরনের ভ্যানিশিং কিংবা মেকআপ ক্রীমেই মিশ্রিত থাকে এক ধরনের এসিড। যদিও এ এসিডের মাত্রা খুবই কম তথাপি একনাগাড়ে দীর্ঘ দিন তা ব্যবহারের ফলে চামড়া পুড়ে যায়।

কে জানে, হয়তো তার আম্মার দো'আ সেদিন সাথে সাথেই কবূল হয়ে গিয়েছিল। কারণ এরপর আবীরকে কেউ কখনো বোরখা ছাড়া বাইরে বের হতে দেখেনি। দেখেনি নামাজ কাযা করতে। বাংলাদেশে আসার পর আবীরকে দেখে আত্মীয়-স্বজনরা বলাবলি করতো- "এমন মেয়ে লাখে একটা মেলে না, যেমন রূপ তেমনি গুণ।" আবার কেউবা বলতো- "এ মেয়ের জন্য যোগ্য ছেলে খুঁজতে হলে সারা বাংলাদেশ চষতে হবে।"

এই হচ্ছে আমাদের আবীর।

রাশেদরা এখানে বাসা নিয়েছে মাস খানেক হলো। একদিন নাস্তার টেবিলে তাকে অবাক করে দিয়ে স্ত্রী আবীর বললো: ক'দিন থেকেই ভাবছি তোমাকে বলবো।

: কি কথা?

: আমাদের তো দু'টো বেডরুম, আম্মাকে নিয়ে এলে হয় না? তার এখন খেদমত পাওয়া প্রয়োজন, আমরাও তাকে সেবা করে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি।

একরাশ বিস্ময় নিয়ে স্ত্রীর দিকে চাইল রাশেদ। মেয়েরা সাধারণতঃ সুযোগ পেলেই আপন মাকে নিজের কাছে রাখতে চায়। পারতঃপক্ষে শাশুড়ীর সাথে থাকে না কিংবা কাছে রাখতে চায় না। আবীর এর ব্যতিক্রম হওয়াতে রীতিমত অবাক হল রাশেদ। আসলেই তার অন্তরটা কাঁদছিল মায়ের জন্য। বাসা নেয়ার পর থেকেই মন চাইছিল মাকে নিয়ে আসতে। আব্বার ইন্তেকালের পর গ্রামে বড় ভাই ও ভাবীর সাথে মা তেমন মানিয়ে নিতে পারছেন না।

স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাশেদ বললো: তোমার মত স্ত্রী পেয়ে আমি ধন্য। সব বধুরাই যদি তোমার মত এভাবে চিন্তা করত তাহলে আমাদের সমাজে শাশুড়ী-বধুর ঝগড়াও থাকতো না, সংসারও অশান্তিময় হতো না।

: হ্যাঁ, আমাদের সমাজে এটা একটা বড় সমস্যাই বটে। শুধু আপন বাবা মায়ের খেদমত করলেই সাওয়াব হবে, আর শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর খিদমাতের কোনই সাওয়াব নেই- এ ধরনের ধারনা আমাদের দেশের মেয়েদের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে আছে। কুরআনের শিক্ষার সাথে প্রচলিত ধারনার আমি কোন মিল খুঁজে পাইনা। পিতামাতার যে অধিকার, যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সন্তানের উপর ইসলাম নির্ধারণ করেছে তা কিভাবে ছেলেটি আদায় করবে যদি তার স্ত্রী স্বামীকে সহযোগিতা না করে? আমি যেমন আমার মা-বাবাকে ছেড়ে তোমার সংসারে এসেছি, তদ্রূপ তোমার ছোট বোনটিও তোমার মা-বাবাকে ছেড়ে অন্যের ঘরে চলে গিয়েছে, এখন আমরা পুত্রবধুরা যদি শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে সেবা যত্ন না করি তাহলে তারা সেবা কার কাছ থেকে পাবে? আমি যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তোমার মাকে তোমার থেকে দূরে রাখি তাহলে তুমি মায়ের খিদমাত কিভাবে করবে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে আবীর চাইল রাশেদের দিকে।

: তোমার কথা অবশ্যই ঠিক। ইসলামের সম্যক জ্ঞানই এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। দুঃখের বিষয়, ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর করতে এ দেশে যারা কাজ করছে, আগুনের দিকে ঝাঁপ দিতে উদ্যত লোকগুলোকে যারা কোমর ধরে ফেরাতে চাইছে, লোকগুলো উল্টো তাদেরই কোমর ভেঙ্গে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। রবীন্দ্র রচনাবলী কিংবা বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাস পড়তে তাদের যত আগ্রহ; ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে তাদের ততই অনীহা।

: ও হ্যাঁ, আজ কিন্তু দুপুরে বাসায় আসতে পারব না।

: কেন?

: বোর্ডের বৈঠক আছে। শুরুই হবে দুপুর দু'টোয়।

: তাহলে আম্মাকে আনতে যাচ্ছ তো?

: অবশ্যই। আগামী বৃহস্পতিবার বাড়ী যাব ঠিক করেছি। শুক্রবার আম্মাকে নিয়ে ফিরব।



: ঠিক আছে, তাহলে আজ-কালের মধ্যেই নারজিসকে ফোন করে দাও। বৃহস্পতিবার তুমি বাড়ী যাবার আগেই যেন তার হাসব্যান্ড তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

: তাতে অসুবিধা হবে না। আমি আজই মীরপুরে ফোন করে দেব।

: নারজিসকে তুমি বোধ হয় যাদু করেছ। ও তো তোমার সান্নিধ্যে থাকতে বেকারার। বিয়ের আগে, মানে তোমাকে দেখে পছন্দ করার পর কি বলেছিল জানো?

: কি বলেছিলো?

: বলেছিল, ভাইয়া, তোমার জন্যে একটা রজনীগন্ধা আনবো। যেন তেন রজনীগন্ধা নয়! ভোরের শিশিরভেজা রজনীগন্ধা। শুধু চেয়েই থাকবে। রূপও বিলাবে, গন্ধও ছড়াবে, কারণ নামের অর্থও সুগন্ধ।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল আবীরের চেহারা। লাজুক হেসে বললো: ও একটু বাড়িয়ে বলেছে।

মৃদু হাসির ঝংকার ছড়িয়ে রাশেদ বললো: না, মোটেই বাড়িয়ে বলেনি। আচ্ছা, আমি চললাম।

: ফী আমানিল্লাহ্।

দৈনিক পত্রিকাগুলোতে চোখ বুলানো রাশেদের রুটিন মাফিক। এজন্য ক্লাশ শুরুর পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট আগেই সে কলেজে আসে। আজও অভ্যাস মত তার প্রিয় দৈনিকটি হাতে নিয়েছে। একটি ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়তেই বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল রাশেদ। তার বাল্যবন্ধু রুবেল। নীচে নামও রয়েছে "মানিক চৌধুরী রুবেল"। আরও তিনটি ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছে। তবে বাকীরা রাশেদের পরিচিত নয়। উপরে বড় হেডিং "চোরাচালান সিন্ডিকেটের কয়েকজন গ্রেফতার"।

কালার ছবি হওয়ায় স্পষ্টই এসেছে রুবেলের চেহারাটি। তবে কৈশোর, যৌবনের সেই অকৃত্রিম, নিঃস্পাপ চেহারা আর নেই। বরং এখনকার চেহারার আড়ালে যেন লুকিয়ে আছে হাজারো পাপ।

রাশেদের চোখের সামনে ভিডিও ক্লিপের মত একটার পর একটা ভেসে উঠতে লাগল তাদের শৈশব, কৈশোর ও কলেজ জীবনের স্মৃতি। ভার্সিটি মাঠে প্রদত্ত রুবেলের ছাত্রাবস্থার সেই বক্তৃতাও আবার রাশেদের মনের পটে ভেসে উঠল.... "ঘুষ, দূর্নীতি ও চোরাচালানী আমাদের সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আসুন আমরা সবাই মিলে এসব প্রতিরোধের শপথ গ্রহণ করি....".

লেখক: ইসলামী চিন্তাবিদ ও গল্পকার, জেদ্দা, সৌদী আরব।
ইমেইল: ataa@icc.net.sa

## প্রথম দেখায় কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্ট

তারিক রিদওয়ান

এবারের সেমিস্টার ব্রেকে দেশে যাওয়া হচ্ছেনা, তাই আগে থেকেই ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিলাম, কিভাবে এই ২২টা দিন পার করব? সিনিয়র ভাইয়াদের কাছ থেকে শুনলাম এ সময়টুকু হয় সবচাইতে বোরিং, খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুম ছাড়া আর কোন কাজ নেই! তাই খুঁজে ফিরছিলাম কি করা যায়? সবচাইতে ভাল উপায় হচ্ছে ভার্সিটির কো-কারিকুলার এক্টিভিটিস এ যোগ দেয়া। সেমিস্টার ব্রেকের সময় একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরাই ক্যাম্পাসে থাকার অনুমতি পায়, লোকাল স্টুডেন্টদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়া বাধ্যতামূলক। যোগ দিলাম ওয়েলকামিং কমিটিতে। ওয়েলকামিং কমিটি হল ISD (International Student Division) এর অধীনে একটি স্টুডেন্ট গ্রুপ। এই গ্রুপের কাজগুলো হলঃ- ১) সারাবিশ্ব থেকে আগত নতুন ইন্টারন্যাশনাল ছাত্র-ছাত্রীদের এয়ারপোর্ট থেকে ভার্সিটিতে নিয়ে আসা, ২) এরপর নতুন স্টুডেন্টদের রেজিস্ট্রেশানের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা, ৩) এরপর তাদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা যেমন- Group Binding, Treasure Hunt, Grand Dinner, KL tour ইত্যাদি……।

আমি ছিলাম Prep & Tech বিভাগে। নতুন স্টুডেন্টদের রেজিস্ট্রেশান হল ১৩ এপ্রিল, এরপর থেকেই আমাদের কাজ শুরু। তবে তার আগে শুধু একটিই কাজ- এয়ারপোর্ট থেকে নতুন স্টুডেন্টদের নিয়ে আসা। রেজিস্ট্রেশান যেদিন হবে, মূলতঃ তার ৭/৮ দিন আগে থেকে নতুন স্টুডেন্টরা আসা শুরু করে, এই সাতদিন ওয়েলকামিং কমিটির বিভিন্ন সদস্য KLIA (Kuala Lampur International Airport) গিয়ে নতুন স্টুডেন্টদের রিসিভ করে এবং আমার ডিউটি ছিল ১০ এবং ১১ এপ্রিল। সেই সুবাদে দেখা হয়ে গেল বিশ্বের সবচাইতে ব্যস্ততম এয়ারপোর্টগুলোর অন্যতম এই এয়ারপোর্টটি নিজ চোখে বাস্তবভাবে উপভোগ করার দারুণ এক সুযোগ!

আমার জীবনের KLIA অংশকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি- ১ম দেখা, ২য় দেখা। **১ম দেখাঃ** এর আগে শুধুমাত্র একবারই এখানে আসা হয়েছিল, যেদিন আমি নিজে নতুন ছাত্র হয়ে এ দেশে এসেছিলাম! তখন মাত্র দু'ঘণ্টা KLIA-তে থাকার সুযোগ হয়েছিল, এরপর তৎকালীন ওয়েলকামিং কমিটি আমাকে ভার্সিটি নিয়ে যায়। সেই প্রথম দিনেই KLIA এর সবকিছু দেখেই আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন KLIA-কে যে অল্প কিছুক্ষণ দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা ছিল খুবই কম, মাত্র দু'ঘণ্টা। কিন্তু সেই "অল্প কিছুক্ষণ" এর মধ্যেই আমি মুখোমুখি হয়েছিলাম আমার জীবনের সবচাইতে আশ্চর্যকর কিছু ঘটনার……।

২৭ জুন ২০০৯, ভোর ৭টা- ঘুম ভেঙ্গে গেল হঠাৎ, চোখ খুলে দেখি সকাল হয়ে



গিয়েছে। Malaysian Airliners এর ফ্লাইট নং MH 147-এ, জানালার পাশে বসে আমি। প্রথম দেখাতেই মালয়েশিয়ার প্রেমে পড়ে গেলাম। আকাশ থেকে সকাল বেলার অদ্ভূত এক দৃশ্য! নিচে তাকিয়ে দেখি যেদিকে চোখ যায়, যতদূর চোখ যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ…… এই সবুজের উপর ঠিকড়ে পড়ছে সূর্যের উজ্জ্বল সোনালী আলো! সেদিনই আমি প্রথম দেখলাম, সূর্যের আলোর রঙ আসলে উজ্জ্বল সোনালী, দূষিত পরিবেশের কারণে বাংলাদেশে সূর্যের আলো হলুদ রঙের মনে হয়। অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম সূর্যের দিকে, আল্লাহর কি অপার সৃষ্টি! আবার দৃষ্টি ফেরালাম নিচের সবুজের মধ্যে, এখন এই সবুজের মাঝে সুতোর মত চিকন কিছু দেখা যাচ্ছে! মনে হয় এটা রাস্তা। প্লেন ধীরে ধীরে নিচে নামছে, পাইলট ঘোষণা করলেন, আর ১৫ মিনিটের মধ্যে প্লেন ল্যান্ড করবে KLIA-তে। প্লেন যতই নিচে নামছে, সুতোর মত রাস্তাগুলো ততই মোটা হচ্ছে আস্তে আস্তে, ছোট্ট গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন পিঁপড়ের দল সারি বেধে কোথাও যাচ্ছে খাবারের সন্ধানে, প্লেন ল্যান্ড করল ভোর ৭টা ৩০মিনিটে।

প্রথম বিদেশের মাটিতে পা রাখা, অদ্ভূত এক অনুভূতি। KLIA এ দেখে আমি হতবাক, এত্তো বিশাল এয়ারপোর্ট…! কোন অভিজ্ঞতাই নেই এখন কোথায় যেতে হবে, তাই অন্যান্য যাত্রীর দেখাদেখি তাদের পিছু পিছু চলতে লাগলাম। বেশ কিছুদূর যাবার পর দেখলাম ট্রেনে করে আরো বহুদূর যেতে হবে এয়ারপোর্টের মূল অংশে যাবার জন্য। বেশ কিছুক্ষণ ট্রেনে করে যাবার পর পৌঁছলাম ইমিগ্রেশান ইউনিট এ। ঠিক তখনই ঘটল আমার জীবনের সবচাইতে বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর একটি। তবে তার আগে ফিরে যাই ঠিক ৬ ঘণ্টা পূর্বে...।

HSIA (তৎকালীন ZIA)-তে ইমিগ্রেশানের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। মালয়েশিয়াগামী বেশিরভাগ যাত্রীই মূলত শ্রমিক এবং এ জন্যই মনে হয় ইমিগ্রেশান ইউনিট এর অফিসারদের আচরণও খুবই বাজে। অবান্তর এবং উদ্ভট সব প্রশ্ন করে যাত্রীকে কিভাবে বেকায়দায় ফেলা যায় এবং এরপর যাত্রীকে উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে দিয়ে বলা হয় যে, আপনাকে যেতে দেয়া হবেনা, কিছু টাকা-পয়সা দেন তাহলে ইমিগ্রেশান পার করে দিব। বেশিরভাগ যাত্রীই শ্রমিক বলে লেখাপড়া জানেন না এমন অনেকেই আছেন, তাদেরকে বোকা বানানো বেশি সহজ ইমিগ্রেশান ইউনিট এর উৎকোচভোগী পশুদের পক্ষে। আমি ইমিগ্রেশানের লাইনে দাঁড়িয়েই দেখছিলাম কিভাবে লাইনে আমার সামনে দাঁড়ানো এক যাত্রীকে এক মানুষরূপী পশু ইমিগ্রেশান অফিসার বেকায়দায় ফেলছিল। প্রথম বিদেশ যাত্রা বলেই আমি বেশ ভয় পাচ্ছিলাম ঐ যাত্রীর অবস্থা দেখে। ভেবেছিলাম ইমিগ্রেশান ইউনিটে মনে হয় এমন আচরণই করা হয় সবাইর সাথে। পরে মনে হয় ঐ যাত্রীর কাছে বেশ টাকা-পয়সা চেয়েছিল ওরা।

এরপর যখন আমার সিরিয়াল এলো, আমি বেশ ভয়ে ভয়ে সামনে গেলাম এবং

পাসপোর্ট জমা দিলাম। ইমিগ্রেশান অফিসারটি পাসপোর্ট দেখে যখন বুঝতে পারলো যে এটাই আমার প্রথম বিদেশ সফর, চেষ্টা করলো এর সুযোগ নিতে। একের পর এক আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলো আমার বাবার নাম কি, মায়ের নাম কি, গ্রামের বাড়ি কোথায়, বিদেশে কেন যাচ্ছি, কি করতে যাচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অবান্তর বেশ কিছু প্রশ্ন সে আমাকে করে……. অথচ এসবকিছুই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে আমার পাসপোর্ট এবং ভিসায়। তবুও সে বলল তার মতে আমি যেতে পারবো না, এরপর ইউনিভার্সিটি থেকে আসা অফার লেটারটি আমার কাঁধ ব্যাগ থেকে বের করে দেখালাম। এরপর সে আমাকে ছাড়তে রাজি হল, দীর্ঘ ১২ কি ১৫ মিনিট চেষ্টা করেও যখন সে এক যাত্রীকে আটকিয়ে তার থেকে কিছু আদায় করতে পারলো না, তখন তার চেহারা বেশ বিধ্বস্ত দেখা গেল। আমি তখন ভেবেছিলাম এটা মনে হয় ইমিগ্রেশানের স্বাভাবিক নিয়ম।

কিন্তু ঠিক ৬ ঘণ্টা পর KLIA ইমিগ্রেশান ইউনিটে পাসপোর্ট জমা দিলাম, আমার পাসপোর্ট এবং ভিসা চেক করতে অফিসারটি সময় নিলেন মাত্র ৩০ সেকেন্ড! এরপর আমাকে পাসপোর্ট ফেরত দেয়ার সময় স্মিত হাসি হেসে বললেন,"Welcome to Malaysia. There's an excellent environment of study waiting for you….. especially in your university. Try hard, may Allah bless you….." উত্তরে আমি কিছুই বলতে পারলামনা, বলবই বা কি? আমি তো বিস্ময়ে একদম বোবা হয়ে তাকিয়ে আছি অফিসারটির দিকে। আমি ভেবেছিলাম এখানেও বোধহয় আমাকে HSIA এর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। এরপর আমি ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

**২য় দেখাঃ** এবার আমি KLIA যাব একজন কমিটি মেম্বার হয়ে। মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। এক্তো নতুন স্টুডেন্টের সাথে দেখা হবে, কথা হবে…… নতুন স্টুডেন্টদের কৌতূহলী চাহনী এবং জিজ্ঞাসা সবসময়ই আমাকে বিমোহিত করে। তাদের সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে।

১০ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৭টায় ভার্সিটি থেকে আমরা ৪ জন- আমি, মামুন (কাশ্মীর), রেজানুর (ইন্দোনেশিয়া), ইসমাইল (সোমালিয়া) ভার্সিটির বাসে করে রওয়ানা হলাম KLIA এর উদ্দেশ্যে যা ভার্সিটি থেকে প্রায় ৯০ কি.মি দূরে, মোটামুটি ৩৫-৪০ মিনিট লেগে যায়। রওয়ানা হয়েছি ১০ মিনিটও পার হয়নি, পৌনে ৮টায় মোবাইলে কল এলো, KLIA ল্যান্ড করেই কল করেছে এক বাংলাদেশী ছাত্র। ইংরেজীতেই কথা হল তার সাথে, কারণ সে কল করেছিল ওয়েলকামিং কমিটির কাছে, আমার পার্সোনাল মোবাইলে নয়। ইচ্ছে করেই তাকে বলিনি যে আমিও বাংলাদেশী, ভাবলাম KLIA গিয়ে ওকে অবাক করে দিব।

প্রায় সোয়া ৮টায় গিয়ে পৌঁছলাম KLIA তে। ইতোমধ্যে কয়েকজন নতুন ছাত্র



পেয়ে গেলাম। এর মধ্যে দু'জন দেখলাম বাংলাদেশী! ওরাও ওয়েলকামিং কমিটিতে একজন বাংলাদেশীকে দেখে মনে হয় বেশ খুশি হল এবং মনে কিছুটা জোর পেল। আরো দু'জন স্টুডেন্ট পেলাম, একজন এসেছে দুবাই থেকে, কিন্তু সুদানের নাগরিক। এরপর নতুন ছাত্রদের সাথে খাওয়া-দাওয়া হল, ভার্সিটি নিয়ে গল্প হল, মালয়েশিয়া নিয়ে গল্প হল, যার যার দেশ নিয়ে গল্প হল…… সত্যিই নতুন স্টুডেন্টদের কৌতূহলী চাহনি আমাদের সবাইকে বেশ আনন্দ দিল।

এর ফাঁকে বাংলাদেশী দু'জনের সাথে ব্যক্তিগতভাবেও কথা হল। একজনের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রাম, আরেকজনের নরসিংদী। কথা বলতে বলতে একসময় প্রসঙ্গক্রমে চলে আসলো দেশের এয়ারপোর্টে কোন সমস্যা করেছিল কিনা বিষয়টা…… বেশ কষ্টের সাথে তারা জানালো HSIA এর অবস্থা। তাদের মুখে আবার শুনলাম সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, যা ঘটেছিল আমার সময়। তবে এবার পরিস্থিতি আরো ভয়ানক। তাদের মধ্যে একজনের কাছে HSIA ইমিগ্রেশান ৭০০০ টাকা দাবী করেছিল। তবে তার এক নিকটাত্মীয় এয়ারপোর্টের একজন কর্মকর্তা হওয়াতে তাকে কোন সমস্যা পোহাতে হয়নি; বরং ঘুষ চেয়ে ঐ কর্মকর্তা নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন।

ভেবে দেখলাম, একজন বিদেশগামী মানুষ, যে HSC পাশ করতে না করতেই এত অল্প বয়সে নিজের পরিবার-পরিজন, প্রিয় মানুষ, দেশ সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে বহু দূরে, এক অজানা ঠিকানায় এবং যাওয়ার কারণ শুধুমাত্র পড়ালেখা। হয়তো তার মনে অনেক স্বপ্ন আছে একদিন দেশে ফেরত আসবে এবং দেশের জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে দেবে। কিন্তু দেশত্যাগের সময়ই যদি কিছু নরপশুর কাছ থেকে এহেন ব্যবহার উপহারস্বরূপ পায়, দেশে ফিরে আসার আগ্রহ কি তার আদৌ থাকবে? হয়ত থাকবে, কিন্তু মনে যে দাগ কেটেছে, তা আজীবনেও মুছে যাবেনা। বরং দেশের এয়ারপোর্টে এমন ব্যবহার পাওয়ার পর যখন বিদেশের মাটিতে পা রেখে সেখানকার এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশান ইউনিটের অফিসাররা তাকে বলে- "Welcome to Malaysia. There's an excellent environment of study waiting for you….. especially in your university. Try hard, may Allah bless you….." এই কথাগুলোই তার মনে গেঁথে থাকবে আজীবন। যা বারবার তাকে দেখিয়ে দিবে নিজ জন্মভূমির সাথে অন্য দেশের পার্থক্য……।

সেদিন বিকেল পর্যন্ত থাকলাম KLIA তে, যতজন নতুন স্টুডেন্ট আসলো তাদেরকে ভার্সিটি পাঠিয়ে দিলাম মামুনের সাথে। আমি, রেজানুর এবং ইসমাইল রয়ে গেছি, কাল নতুন ছাত্রদের নিয়ে আমরা ভার্সিটি ফেরত যাব এবং অন্য ৩জন ওয়েলকামিং কমিটির মেম্বার আসবে। এয়ারপোর্টে সারাদিন দৌড়াদৌড়িতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সেদিন দুপুরেই হোটেলে দু'টো রুম বুক করে এসেছিল ইসমাইল, এখন সরাসরি গিয়ে রুমে গিয়ে কাত হয়ে যাব বিছানায়।

হোটেলে গিয়ে দেখি এটা ফাইভ স্টার হোটেল! জীবনে কোনদিন এত্তো আলীসান হোটেলে থাকার সৌভাগ্য হয়নি আমার, ভবিষ্যতে হবে কিনা তাও জানিনা। তবে কপালের জোরে কিভাবে যেন মিলে গেল। মালয়েশিয়াতে এখন সারাবিশ্ব থেকে লাখ লাখ পর্যটক আসে এবং সে কারণেই হোটেলগুলোও এখন বিদেশী পর্যটক দিয়ে ভর্তি।

প্রথম বেশ কিছুক্ষণ একটু অন্যরকম লাগছিলো, ঘোরের মধ্যে ছিলাম ফাইভ স্টার হোটেলের সবকিছু দেখে। সবকিছু এত বেশি সাজানো গুছানো, এত বেশি পরিপাটি যে, নির্বাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। রুমে গিয়ে দেখলাম, এ দেখি জাস্ট একটা রুম না, পুরা সংসার পেতে বসা যাবে এখানে! টিভি, ফ্রিজ, ইন্টারনেট, রান্না-বান্নার সুবিধা, সবকিছুই বিমোহিত করল আমাকে। ভাবলাম দু'টো দিন বেশ ভালই কাটবে এই হোটেলে। গোসল করে নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ নেট ব্রাউজ করলাম, মেইল চেক করলাম, এবার ঘুমানোর পালা। খুব তাড়াতাড়ি ঘুমোতে হবে, কারণ আগামীকাল ভোর থেকেই আবার নতুন স্টুডেন্টদের আসা শুরু হবে। তারা যদি এসে আমাদের না পায় তাহলে বেশ সমস্যা হয়ে যাবে। কিন্তু আস্তে আস্তে ফাইভ স্টার হোটেলের এত অভিজাত সব ব্যবস্থা আমার কাছে বিরক্তিকর ঠেকলো। বিছানায় যে আরাম করে ঘুমাবো সেই উপায়ও নেই, বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেই নরম ফোমের কারণে শরীর এক্কেবারে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যায়; কি যন্ত্রণা! এভাবে হলে ঘুম আসবে কিভাবে? মিস করছিলাম ভার্সিটি হোস্টেলে আমার বিছানাটা, একটা তোষক দেয়া ঐ নরমাল বিছানাটাই সবচেয়ে আরামদায়ক। আস্তে আস্তে ফাইভ স্টার হোটেলের সবকিছুই আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠলো। এত সাজানো গোছানো অভিজাত ফাইভ স্টার হোটেলের তুলনায় ভার্সিটি হোস্টেলে আমার রুমটা এতোটা অভিজাত ও পরিপাটি না হলেও, সেখানে হৃদয়ের তৃপ্তি খুঁজে পাই আমি।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর এই ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দেবার পরও ঘুম আসছিলোনা। রুমের জানালা দিয়ে KLIA স্পষ্ট দেখা যায়, শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছি রাতের আলোকিত KLIA এর দিকে। রাতের বেলায় KLIA দেখতে আরো ভয়ানক সুন্দর! অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, প্রতি মিনিটেই একটা বিমান ফ্লাই করছে অথবা ল্যান্ড করছে! আমার এক বন্ধু বলেছিল এটা বর্তমানে বিশ্বের সবচাইতে ব্যস্ততম এয়ারপোর্টগুলোর একটি, সত্যিই তাই। মূলতঃ আজ সকালে KLIA পৌঁছেই আমার অবাক হবার পালা শুরু হয়েছিল। যেদিকেই চোখ যায় শুধুই মানুষ আর মানুষ, মনে হচ্ছিল যেন মক্কায় হজ্জ করতে এসেছি! এত বিশাল এয়ারপোর্ট, সত্যিই বিশাল। এতই বিশাল যে, গত নভেম্বরে দেশে গিয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম না সত্যিই কি আমি HSIA তে ল্যান্ড



করেছি? নাকি সিলেটের ওসমানীতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে? কারণ এখানে আসার আগে দেখছিলাম HSIA বিশাল বড়, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দোতালা ছোট্ট একটা বিল্ডিং।

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দু'চোখে কোন ঘুম নেই.... প্রতি মিনিটে প্লেনের ল্যান্ডিং ও টেক-অফ করা দেখছি এবং বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করছি এটা কোন এয়ারলাইন্স, এই যন্ত্রচালিত পক্ষীদের গন্তব্য কোথায়....?

প্লেন নিয়ে এসব ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেল আমার Mechanics (Statics) শিক্ষক "জাফর সৈয়দ মোহাম্মদ আলী"-র করা একটি প্রশ্নের কথা, যে প্রশ্নটি তিনি ক্লাসের সকল ছাত্র-ছাত্রীর কাছে করেছিলেন। প্রশ্নটির উত্তর হয়তো আমরা সকলেই জানি, কিন্তু প্রশ্নটি ছিল অদ্ভুত ধরনের বিস্ময়কর যা নিয়ে আমরা কেউই কখনো ভেবে দেখিনা। প্রশ্নটা এরকম- "আচ্ছা, তোমরা প্রায়ই খবর পাও যে অমুক দেশে একটি প্লেন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ক্র্যাশ করে মাটিতে পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কি কখনো শুনেছ অথবা দেখেছ যে একটি পাখি উড়তে উড়তে দুর্বল হয়ে মাটিতে ভূপাতিত হয়েছে? অথচ এমন অনেক পাখি আছে যারা দীর্ঘদিন ধরে একটানা আকাশে উড়ে বেড়ায়। অথবা এমন কোন পাখি দেখেছ যারা বিমানের মত অনেক দূর থেকে প্রস্তুতি নিয়ে ল্যান্ড করে? অথবা ছোট্ট মশার কথা চিন্তা করো, যখন এই পতঙ্গটি তোমাদের শরীরের কোন স্থানে বসে, তখন তোমরা সাথে সাথে থাপ্পড় মেরে মশাটিকে তাড়িয়ে দাও অথবা মেরে ফেলতে চাও। কিন্তু মশাটি কি করে? মশা কি প্লেনের মত এক মাইল দূরত্বের রানওয়েতে দৌড় দিয়ে তারপর টেক-অফ করে? নাকি মশাকে আঘাত করার জন্য তোমার হাত উঠার সাথে সাথেই সে টেক-অফ করে এবং ইমিডিয়েটলি ল্যান্ড করে তোমার শরীরেরই অন্য আরেক স্থানে! ঠিক একই কথা প্রযোজ্য পাখি শিকারী এবং পাখির বেলায়। শিকারীর গুলির আওয়াজ শুনার সাথে সাথেই পাখিটি টেক-অফ করে, পাখির প্রয়োজন হয় না এক মাইল দৌড় দিয়ে তারপর টেক-অফ করতে। তোমরা কি জানো এর কারণ কি?"

আমাদের মাথা তখন ভোঁ ভোঁ করছে, কি উত্তর দিব আমরা? এ নিয়ে তো কখনোই ভেবে দেখিনি। সত্যিই তো! উড়তে উড়তে দুর্বল হয়ে মাটিতে ভূপাতিত হয়েছে অথবা বহুদূর থেকে প্রস্তুতি নিয়ে ল্যান্ড/টেক-অফ করেছে এমন কোন খবর তো আমরা শুনিনি, দেখিওনি। বরং দেখেছি প্রতি বছর শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে অতিথি পাখি আসে এবং এটি একটি direct flight, কোন যাত্রা বিরতি ছাড়াই। জানিনা এত শক্তি পাখিগুলো কোথা থেকে পায়? তাদের ছোট্ট পেটে তো আর বিমানের মত এত পেট্রোল/খাবার আঁটেনা! আমরা সবাই ভাবছিলাম কি উত্তর দিব? সবাই বেশ ঘোরের মধ্যে আছি ..... স্যার আমাদের এ প্রতিক্রিয়া দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, "এর প্রধান কারণ হল কীটপতঙ্গ/পাখির মধ্যে থাকে Flexible wing আর বিমানের মধ্যে থাকে একদম সাধারণ

wing. এখন বিজ্ঞানীরা flexible wing দিয়ে প্লেন তৈরী করার চেষ্টা করছেন যার ফলে পাখির মতো তাৎক্ষণিকভাবে ল্যান্ডিং/টেক অফ করা যাবে। হয়ত একদিন তারা সফল হবে, কিন্তু তারপরও প্লেন ক্র্যাশিং কেউ থামাতে পারবেনা অথবা আবিষ্কার করতে পারবেনা এমন কোন ইঞ্জিন যা দিয়ে দীর্ঘক্ষণ আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় থাকা যাবে এবং এখানেই হল মানুষের সৃষ্টি এবং আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে প্রধান পার্থক্য! আমি তো মাত্র একটি উদাহারণ দিলাম, আল্লাহর এমন অসংখ্য সৃষ্টি আছে যেগুলো নিয়ে আমরা কখনোই ভেবে দেখিনা, ভাবতেও চাইনা; বরং আমরা ভীষণ অকৃতজ্ঞ এবং স্বার্থপর! তুমি নিজের শরীরের দিকেই তাকিয়ে দেখো, এটাই হল আল্লাহর এক রহস্যময় সৃষ্টি"।

সেমিস্টারের শেষ ক্লাসে স্যার আমাদের উদ্দেশ্যে উপদেশস্বরূপ একটি কথাই বলেছিলেন, "তোমরা এখানে এসেছ জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে, সার্টিফিকেট অর্জনের উদ্দেশ্য নয়। যত বেশী পারো জ্ঞান লুফে নাও এবং পড়ালেখা শেষে নিজের সকল জ্ঞান ও শক্তি আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবায় খরচ করো এবং সে যদি তোমার শত্রুও হয়, তবুও একাজে কখনো পিছপা হবেনা। স্বার্থপর ও লোভী না হয়ে হিংসা ও লোভমুক্ত একটি হৃদয় তৈরী কর"।

স্যারের এসব কথাগুলো এখনো যেন কানে বেজেই যাচ্ছে... আমি একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করি যে, এমন একজন শিক্ষকের সান্নিধ্য পেয়েছি বলে আমার জীবন ধন্য! প্রথম দিন স্যারকে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলাম এবং এখনো হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, একজন মানুষ এত সাদাসিধেভাবে কিভাবে জীবন ধারণ করে যাচ্ছেন! অথচ তার ভিতরটা যে কত গভীর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত তা নিশ্চয়ই তাকে দেখে বুঝার সাধ্য নেই আমাদের। স্যার হলেন ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের চেন্নাই এর অধিবাসী। পড়ালেখা করেছিলেন ভারতের এবং বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় IIT এ। এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারং এর উপর PhD শেষ করে শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। অথচ তিনি ছিলেন IIT এর সেরা ছাত্র, অসংখ্য লোভনীয় অফার তার কাছে এসেছিল কিন্তু তা তিনি গ্রহণ করেননি। মাঝে বেশ কিছুদিন ভারতের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে এবং "অগ্নি" মিসাইল প্রজেক্টে তিনি বেশ সফলতার সাথে কাজ করেছেন, এ থেকেই বুঝা যায় স্যার কতটা মেধাবী ছিলেন। এবং স্যার ছিলেন সত্যিকারের মেধাবী, সকল দিক দিয়েই.....।

এখনো দেখা হয় স্যারের সাথে, দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। স্যারের যে রেজাল্ট এবং মেধা, হয়ত পারতেন অনেক ধনী একজন মানুষ হতে। কিন্তু তিনি হয়ত চেয়েছিলেন জ্ঞানার্জনে সবার চাইতে ধনী হতে এবং তার সেই জ্ঞান আমাদের মত নবীনদের মাঝে বিলিয়ে দিতে....এজন্যই মনে হয় পারেননি। শেষ ক্লাসে মনে হয় একারণেই আমাদের সেই উপদেশ দিয়েছিলেন।



কিছুদিন আগে Maher Zain এর একটি গান শুনেছিলাম যার সারমর্ম আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে স্যারের সেই কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি মনে হলো আমার কাছে। সত্যিই এতসব চিহ্ন আমাদের আশেপাশেই আছে তবুও কেন মানুষ বিশ্বাস করেনা যে, এসব কিছুর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন? ভাল লাগলো গানটা, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার না করে পারলামনা-

Look around yourselves / Can't you see this wonder / Spreaded infront of you / The clouds floating by / The skies are clear and blue / Planets in the orbits / The moon and the sun/Such perfect harmony/

Let's start question in ourselves / Isn't this proof enough for us / Or are we so blind / To push it all aside.. / No...

We just have to / Open our eyes, our hearts, and minds / If we just look bright to see the signs / We can't keep hiding from the truth / Let it take us by surprise / Take us in the best way / (Allah..) / Guide us every single day.. / (Allah..) / Keep us close to You / Until the end of time...

Look inside yourselves / Such a perfect order / Hiding in yourselves / Running in your veins / What about anger love and pain / And all the things you're feeling / Can you touch them with your hand? / So are they really there?

When a baby's born / So helpless and weak / And you're / watching him growing.. / So why deny / Whats in front of your eyes / The biggest miracle of life...

Open your eyes and hearts and minds/If you just look bright to see the signs/We can't keep hiding from the truth/Let it take us by surprise/Take us in the best way/(Allah.)/Guide us every single day../(Allah)/Keep us close to You/Until the end of time…

Allah../You created everything/We belong to You/Ya Robb we raise our hands / Forever we thank You.. / Alhamdulillah..

**Artist: Maher Zain**

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Dm6NtnU0yXw

ইমেইল: tariq.ridwan@gmail.com

# ইন দা আরলি আওয়ার্সঃ
# রিফ্লেকশন অন স্পিরিচুয়াল এন্ড সেলফ ডেভেলপমেন্ট

মূল: খুররম মুরাদ

অনুবাদ: ফয়সাল তারিক

(মে সংখ্যার পর...)

**৬। তাজকিয়া- একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া**

ইসলাম ঐ ধরনের আত্মশুদ্ধি পদ্ধতি সমর্থন করে না যেখানে আমরা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দূর্নীতিতে নিমজ্জিত থাকতে পারব। তাজকিয়া অবশ্যই আমাদের জীবনের সবদিক পরিবেষ্টনকারী হতে হবে। অর্থাৎ এটা যেমন আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, তেমন করবে তার সামাজিক প্রকাশকেও। সবকিছু অবশ্যই 'আল্লাহর ইচ্ছা' অনুসারে হতে হবে।

এই 'আল্লাহর ইচ্ছা' অনুসরণের জন্য আপনার দরকার আপনার মনোযোগ দাবী করে এমন কর্তব্যসমূহ। যেমন, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, অন্যদের প্রতি কর্তব্য এবং নিজের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদির মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য অর্জনের চেষ্টা করা ও তা বজায় রাখা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে যে কোন রকমের চরমপন্থা বর্জনের উপদেশ দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমরকে বলেছেন:

"আমি কি এটা ঠিক শুনেছি যে, তুমি প্রত্যেক দিন রোযা রাখ আর সারারাত ইবাদত কর? আব্দুল্লাহ্ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লার রাসূল'। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি এটা করোনা। রোযাও রাখ আবার খাও এবং পানও কর। রাতে ইবাদতও কর আবার নিদ্রাও যাও। অবশ্যই তোমার উপর তোমার শরীরের অধিকার আছে, তোমার উপর তোমার চোখের অধিকার আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে"। (বুখারী ও মুসলিম)

আপনি যদি তাজকিয়ার ব্যাপারে সার্বজনীন ভাবে অগ্রসর না হন, তাহলে দেখবেন আপনার জীবন নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে যেখানে কোন একটা অংশ আরেকটা অংশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। এর একমাত্র পরিণতি হতে পারে অসংগতিপূর্ণ ও অসুখী জীবন। পক্ষান্তরে আপনি যদি সার্বজনীন ভাবে তাজকিয়া অর্জনের চেষ্টা করেন তাহলে দেখবেন আপনার জীবনের প্রত্যেকটা অংশ অন্য অংশের জন্য পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। এটাই, আল্লাহ্ চাইলে, আপনার তাঁর ও জান্নাতের পথে সাধনাকে সহজ ও কল্যাণময় করবে।

আল্লাহর পথে চলার সাধনায় অগ্রগতির চেষ্টায় সবসময় খেয়াল রাখবেন যে, আপনার সামনে একটা চমৎকার উদাহরণ আছে। তিনি হচ্ছেন রাসূল (সাঃ)। আমরা প্রায়ই আমাদের প্রিয় খেলোয়াড়, পিতামাতা, শিক্ষক, বন্ধু কিংবা অন্য যারা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাদের অনুকরণের চেষ্টা করি। আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সবচেয়ে সুন্দর উদাহরন হচ্ছে রাসূল (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক বিকাশ। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:



لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে আছে একটি উত্তম আদর্শ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের আকাঙ্ক্ষী এবং বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে। (আল আহযাব: ২১)

**তাজকিয়ার কল্যাণ ও উপকারিতা**

আপনার আত্মশুদ্ধি ও তার উন্নতির জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার ভাবে পথ নির্ধারন করা ও জান্নাত অর্জনের উপায় এবং পদ্ধতিগুলো বিবেচনা করা। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র আপনার আত্মাকে পরিশুদ্ধই করবে না; বরং আপনার সমগ্র জীবনকেই প্রভাবিত করবে এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুসরণ করা আপনার কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহর ইচ্ছা অনুসরণই প্রকৃতপক্ষে তাজকিয়া; যা শীঘ্রই আপনার সকল প্রচেষ্টাকে আপনার চূড়ান্ত লক্ষ্য-আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত-এর দিকে পরিচালিত করবে।

আপনি জেনে নিন যে, প্রত্যেকটি গোনাহ্ ক্ষমার মাধ্যমে মোছা সম্ভব, আর ক্ষমাশীলতাই জান্নাতের নিশ্চিত পথ। আপনি আপনার আত্মিক উন্নতির চেষ্টা করার সাথে সাথে অবিরত আপনার সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"তবে তারা ছাড়া যারা (ঐসব গোনাহের পর) তাওবা করেছে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে। এ ধরনের লোকদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ্ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (আল ফুরকান: ৭০)

এটা ভুল ধারনা যে, কেউ জান্নাতকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারন করলেই সেখানে কোন ধরনের চেষ্টা ছাড়াই পৌঁছে যাবে। এটাও ভুল ধারনা যে, শুধুমাত্র জীবনের নির্দিষ্ট একটি দিক তথা 'ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক' দিকে মনোনিবেশ করলেই জান্নাত পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে, জান্নাত চুড়ান্ত লক্ষ্য মানেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সবসময় তাজকিয়া অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। উদাহরন স্বরূপ নিচের প্রশ্নগুলো বিবেচনা করুনঃ

Ø সততা কি জান্নাত অর্জনের একটা উপায়?

Ø দায়িত্বানুভূতি কি আমাকে জান্নাত অর্জনে সক্ষম করবে না?

Ø অন্যের প্রয়োজন পূরনের ক্রমাগত চেষ্টা কি আমাকে জান্নাতের যোগ্য করবে না?

Ø অপ্রয়োজনীয় কথা ও লক্ষ্যহীন কাজ থেকে বিরত থাকা কি আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে না?

Ø সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ থাকা কি জান্নাতের চাবি নয়?

Ø সঠিক পথের লোকদের অন্যদের থেকে আলাদা করে যে দু'টি বৈশিষ্ট্য- ওয়াদা রক্ষা করা আর সময়মত নামাজ আদায় করা-কি আমাকে জান্নাতের মহাসড়কে নিয়ে যাবে না?

Ø জান্নাত অর্জনের জন্য উপরের সবগুলো গুণ অর্জনের চেষ্টা করা কি উচিৎ নয়?

প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা, যা ন্যায় সঙ্গত ও জান্নাতের লক্ষ্যে করা হয়, সবই তাজকিয়ার প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ইনশাআল্লাহ্, আপনি যদি তাজকিয়ার সকল পূর্বশর্ত, কল্যাণ ও সুবিধা সম্পর্কে অবগত থাকেন, আপনি নিশ্চিত ভাবেই আপনার আত্মোন্নয়নের জন্য আরও সহজ ও আরও প্রতিদানপূর্ণ সঠিক পরিবেশ, প্রকৃত সাথী ও ভ্রাতৃত্ব এবং সবচেয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী খুঁজে পাবেন।

فَبَشِّرْ عِبَادِ – الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

"আমার সেসব বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও, যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার ভাল দিকটি অনুসরণ করে। এরাই সেসব মানুষ যাদের আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন এবং এরাই বুদ্ধিমান।" (আয্ যুমার: ১৭-১৮)

**সারাংশ**

একমনে শুধুমাত্র জান্নাত পাবার আকাংখাই হচ্ছে একজন মুসলমানের জীবনের সর্বাঙ্গীন লক্ষ্য। এই জান্নাত পাবার আকাঙ্ক্ষাটি একটি জীবন-বিস্তৃত প্রক্রিয়া যা যেকোন মুহূর্তে প্রজ্জ্বলিত হতে পারে এবং এই আকাংখাই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও গতি যোগায়।

রাসূল (সাঃ) এর আত্ম-উন্নয়নের মডেলই আপনার মডেল। জান্নাত অর্জনের অন্বেষায় আপনাকে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আপনার পালনীয় কাজগুলোর ভার নিতে হবে, আপনার কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্ভেজাল প্রচেষ্টা চালানোর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করতে হবে, সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে আর ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে হবে।

মনে রাখবেন, সকল কাজই তাজকিয়ার অবিচ্ছিন্ন অংশ যদি তা বৈধ এবং জান্নাত অর্জনের লক্ষ্যে করা হয়ে থাকে। আর সব গোনাহই ক্ষমাশীলতার মাধ্যমে অপসারণযোগ্য এবং ক্ষমাশীলতাই জান্নাতের নিশ্চিত পথ।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى – فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"(আন্ নাযি'আত: ৪০-৪১)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সেসব তাকওয়া অর্জনকারীদের মধ্যে গণ্য করুন যাদের কথা আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন: بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা আল্লাহ্ যাকে চান তাকে দেন। আর (তারা যে শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করে না সেটা আসলে) তাদের উপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হয় না।"(আন্ নিসা: ৪৯)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকতো তাহলে তোমাদের একজনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহই যাকে চান তাকে পবিত্র করে দেন এবং আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও জ্ঞাত।" (আন্-নূর: ২১) (ক্রমশ...)

অনুবাদক: গবেষক, Milton Keynes, UK
যোগাযোগ: crosslayer@gmail.com



## তৃষ্ণা মেটালো একটি পুরোনো কিতাব

লিটন পাটোয়ারী

আকাশ হতে রোদের কণাগুলো বাতাসে ভর করে
স্পর্শ করে পৃথিবীর মাটি, আমাদের শরীর, গাছের পাতা
সমুদ্রের তুলতুলে বুক, কঠিন পাথর এবং যা কিছু প্রকাশ
দৃশ্যমানকে রাঙায়, সাজায়, দৃষ্টিমানকে দেখায়, জ্বালায়
দু'চোখের ঝলসানো দৃষ্টি নিয়ে জানতে চাইলাম, বল-
তোমার উত্তাপে কতদিন জ্বলে জ্বলে আমি হবো উজ্জ্বল
আলোকিত করতে পারব আমার এ বিদঘুটে চারপাশ?

হাওয়ার দোলে দুলতে দুলতে নেমে আসে বৃষ্টিকণা
চৌচির মাটির ফাটল থেকে এ বুকের দেয়াল
সবকিছু সিক্ত করে, এনে দেয়া প্রাণের সঞ্চার
এ কণা মরুর বুকে সাজায় সবুজ, করে সমুদ্র উত্তাল
ব্যর্থ জীবনের অশ্রুর সাথে বারি মিশিয়ে বললাম-
তোমার জলে কতটা ভিজলে, কতটা সমুদ্র পাড়ি দিলে
আমি নৈতিকতার সবুজে সাজবো, সাজাবো এ পঙ্কিল মরু?

পর্বতের অশ্রু বলে কেউ, কেউ বলে অলৌকিক তুমি
সুউচ্চা শৃঙ্গ থেকে ধেয়ে প্লাবিত কর অঞ্চল, চাষের ভূমি
পাহাড়ের বেদনাকে ধুয়ে নিয়ে যাও সাগরের নোনা জলে
মাছেরা খেলা করে তোমার স্রোতে, জোয়ারে ও ভাটার টানে
কাশবনের ধার ঘেঁষে নিরবে গিয়ে জানতে চাইলাম, বল-
কতটা উপর থেকে আছড়ে পড়তে পারলে আমি নদী হব
তৃষ্ণা মেটাবো জীবনের, বন্দেগীর, প্রার্থনার, প্রশান্ত সফলতার?

কেউ বলেনি সে কথা, যে কথা বলেছে একটি পুরোনো কিতাব
বহু শতকের পুরোনো এক পাহাড়ে এসেছিল রাতের অন্ধকারে
আলোকিত করেছিল পাহাড়, পথ, জনপদ, দীঘল মরু প্রান্তর
প্রশান্ত হলো অশান্ত ডাঙ্গা, সাগরের তলা, বাতাসের গুঞ্জণ
উপছে পড়েছিল সে আলো কমলা লেবুর উপমায় যেমন ভূগোলক
আধেক পৃথিবীকে করেছে আলোকিত, ভিজিয়েছে নৈতিকতায়
মিটিয়েছে জীবনের তৃষ্ণা, বন্দেগী আর প্রার্থনার প্রতিদানে।

আমি জানতে চাইনি তার কাছে, সে আমায় বলে গেছে অবিরত
জীবনের ওপার থেকে এপার, এপার থেকে ওপারের নানা কথা
ছুঁতে গেলাম তাকে, বলে- 'পবিত্র হও', সে পবিত্র করলো আমাকে
জীবনের কাঠামোতে এনে দিল এক নতুন ধারা, যেন এইতো চাওয়া
আমি মাটিকে আঁকড়ে ধরলাম, সে আমায় দেখালো আমার নিবাস

এ মাটির গভীরে নয়; ঐ আকাশের কোথাও, কোন এক কোণে
চির যন্ত্রণার জাহান্নাম অথবা অনন্ত শান্তি-প্রশান্তির জান্নাতে।
২৭ জুন ২০১১

## যতই ভুলি চির মৃত্যুরে

মাহবুবা সুলতানা লায়লা

দ্যাখনি কো তুমি
নবী জীবনের ইতিহাস খুলে;
দ্যাখনি বলেই শান্তিহীন সকলে
কুরআনের বিধান ভুলে।

মাটির এই পৃথিবীতে
মাটির এ দেহটাকে;
যতই করি যতন
একদিন এ সুন্দর দেহের
সত্যই হবে পতন।

মৃত্যুকে যতই করি মোরা
মন থেকে অবহেলা,
মৃত্যু সত্যই আসবে
যখন ফুরাবে বেলা।

যতই যাই না কেন মোরা
আখেরাতের কথা ভুলে,
একদিন সত্যই যেতে হবে
চির মৃত্যুর কোলে।

কি হবে আর ধরার বুকে
আনন্দেতে মেতে?
একদিন তো হবেই হবে
মৃত্যুর স্বাদ পেতে।



## জিজ্ঞাসা ও জবাব

জবাব দিচ্ছেন: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
পিএইচডি (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা),
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান- ফেকাহ্ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

**প্রশ্ন ৬:** আমরা যারা দীর্ঘকাল প্রবাসে স্বীয় পরিবার থেকে দূরে থাকি এবং এতে করে স্ত্রী তার কিছু হিস্যা হতে বঞ্চিত হয়। আর আমরা অনেকেই এমন সামর্থবান নই যে, প্রতি বছর দেশে যাব। ফলাফলে কিছু অনাচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এদিকে আমরা জীবন চালানোর তাগিতে প্রবাসে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। এখন আমার প্রশ্ন হলো- আমাদের এভাবে দীর্ঘকাল বিদেশে থাকা কি ইসলাম সম্মত?

-মোহাম্মাদ ইসমাঈল ভুঁইয়া, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব।

**উত্তর:** প্রবাস জীবন যাপন করা যদি জীবিকার তাগিদে হয়, তবে সেটা অবশ্যই স্ত্রীর অনুমতিতে হতে হবে। প্রতি চার মাসে একবার স্ত্রীর কাছে যাওয়া জরুরী। যদি স্ত্রী অনুমতি না দেয় তবে সেক্ষেত্রে প্রবাসে থাকলে স্ত্রীর হক আদায় না করার গোনাহে পতিত হতে হবে। আর যদি এ কারণে স্ত্রী কোন গোনাহে জড়িয়ে পড়ে তবে তার জন্য স্বামীও কিছুটা দায়ী হবে। সুতরাং স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত চার মাসের বেশী কেউ দূরে বা প্রবাসে থাকার অধিকার রাখে না।



**প্রশ্ন ৭:** সফরের দূরত্ব কত কিলোমিটার হলে তা শরীয়তে বর্ণিত সফর বলে গণ্য হবে? এছাড়া আমরা যে শহর থেকে গ্রামে যাওয়া আসা করি কিংবা কিছুদিনের জন্য কোথাও যাই, সেসব ক্ষেত্রে দূরত্ব, দিন ও অবস্থা কিভাবে কত হিসাব করব?

-সারওয়ার আলম, বরাইয়্যার হাট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

**উত্তর:** সফরের দূরত্ব কত কিলোমিটার হবে, এটা খুব বেশী নির্ধারিত আকারে হাদীসে বর্ণিত হয়নি। সাধারণতঃ যেটাকে মানুষ সফর বলে সেটাই সফর। তবে কোন কোন হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদেরকে উসফান স্থান পর্যন্ত সফর করতে নিষেধ করেছেন। আর মক্কা থেকে উসফান এর দূরত্ব প্রায় ৪৮ মাইল। সে হিসেবে অধিকাংশ আলেমের মতে, কেউ যদি ৪৮ মাইল দূরত্বের সফর করে তবে সেটা সফর বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে মাহরাম ব্যতীত একদিন এক রাত, অবার অপর বর্ণনায় তিন দিন তিন রাত সফর করতে নিষেধ করেছেন, এখান থেকেও কোন কোন আলেম ৪৮ মাইল নির্ধারণ করেছেন। তবে এগুলোর দলীল খুব স্পষ্ট নয়।

মোটকথা, সাধারণত মানুষের পরিভাষায় যা সফর, তা-ই সফরের দূরত্ব নির্ধারিত হবে।

শহর থেকে গ্রামে যাওয়া আসার ব্যাপারটি দূরত্ব ও গ্রামে তার বাড়ী আছে কি না সেটার উপর নির্ভরশীল। যদি শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব সফরের দূরত্ব হয়, তবে সে গ্রামে পৌঁছা পর্যন্ত অবশ্যই মুসাফির। তাই সে পথিমধ্যে কসর নামায আদায় করবে। তারপর গ্রামে যদি তার বাড়ী থাকে তবে সেখানে সে কসর করবে না। মনে রাখা দরকার যে, কোন মানুষের কয়েকটি বাড়ী থাকতে পারে। সে কয়েক স্থানেই অবস্থান করতে পারে। নিজ বাড়ীতে কেউ মুসাফির হবে না, যতই দূর হোক না কেন।

আর যদি গ্রামে নিজ বাড়ী না থাকে, তবে সে যদি সেখানে মতান্তরে ৪/১৫/১৯ দিন অবস্থানের নিয়ত করে, তবে তাতেও কসর নেই। আর যদি এর চেয়ে কম অবস্থান করে তবে সেখানে তাকে কসর আদায় করতে হবে।

**প্রশ্ন ৮:** পুতুল কিংবা প্রাণীর প্রতিকৃতি বাচ্চাদের খেলনা হিসেবে ব্যবহার করতে পারব কি না? যদি পারি তাহলে সেসবকে শো-কেইস বা ঘরের বিভিন্ন জায়গায় সাজিয়ে রাখা যাবে কি না?

-আসিফ ইকবাল, পলাশ, নরসিংদী, বাংলাদেশ।

**উত্তর:** বাচ্চাদের জন্য পুতুল ইত্যাদি একমাত্র খেলনা আকারে রাখা যাবে যদি পুতুলটি শালীন হয়, কিন্তু সেটা শো-কেইসে সাজিয়ে রাখলে সেটা আর খেলনার পর্যায়ে পড়বে না। বরং তা হাদীসে নিষিদ্ধ বস্তুতে পরিণত হবে। অর্থাৎ অত্যন্ত সীমিত আকারে খেলনা হিসেবে ছোট বাচ্চাদের জন্য তা দেয়া যাবে, কিন্তু কোন ক্রমেই সেটা সাজিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

**প্রশ্ন ৯:** কোন্ কোন্ সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে এবং কি পরিমাণ করে আদায় করতে হবে? স্বর্ণ, রৌপ্যসহ অন্যান্য যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হবে সেগুলোর ব্যবহার্যটুকুর উপরও কি যাকাত দিতে হবে? যদি না হয়, তাহলে ব্যবহার্য সম্পদের আলাদা আলাদা পরিমাণ সর্বোচ্চ কতটুকু ধরা যাবে। যেমন কেউ অনেক গুলো গয়না অদল-বদল করে পরে, এর পরিমাণ অনেক, তাই এর সীমারেখা জানতে চাই।

-আহসান উল্লাহ্, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

**উত্তর:** যে সমস্ত সম্পদের যাকাত দিতে হবে, তা চার শ্রেণীর। এক. স্বর্ণ বা রৌপ্য। দুই. ফসল ও ফল। তিন. ব্যবসায়ী অর্জন। চার. যমীন থেকে যা বের হয়। যেমন খনি, ইত্যাদি। তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে, যদি কারও কাছে ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য থাকে বা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ থাকে, তবে তাকে তার জন্য যাকাত দিতে হবে। তখন সেটার ২.৫% পারসেন্ট হারে যাকাত দিতে হবে। (অর্থ হোক বা স্বর্ণ বা রৌপ্য)। সাধারণ টাকা-পয়সার হিসেবও স্বর্ণ বা রৌপ্যের দামের উপর হিসেব করে ফকীরদের জন্য যা উপকারী সে হিসেবে দিতে হবে।

ফসল ও ফলের যাকাতের ব্যাপারে সঠিক মত হচ্ছে যে, তা যদি ৬৫৩ কেজি (৩০০ সা') হয় বা তার বেশী হয়, তবে তাতে যাকাত দিতে হবে। তারপর যদি ফসল বা ফল এমন হয় যে, তাতে নিজস্ব খরচে পানি বা সেচ করতে হয়, তবে উৎপন্ন দ্রব্যের ২০ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। আর যদি নিজস্ব খরচে পানি দিতে না হয়, তবে তাতে ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

ব্যবহার্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলংকারের ব্যাপারে সঠিক মত হলো যাকাত দিতে হবে। কারণ, হাদীসে তা-ই স্পষ্ট। সুতরাং কারও ব্যবহার্য স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তবে তাতে যাকাত দিতে হবে।

**প্রশ্ন ১০:** আল্লাহর নির্ধারিত পরিস্থিতি ও অসুস্থতার কারণে আমি বিগত রমযানের রোযা রাখতে পারিনি। বছরের বিগত দিনগুলোতেও সেসব রোযার কাযা আদায় করতে পারিনি, সামনে রমযান মাস আবারো আসছে। এদিকে এখন আমার কোলে বাচ্চা এসেছে, যদি রোযা রাখি তো বাচ্চা দুধ কম পাবে, এ কারণে এখনো রোযাগুলো আদায় করতে পারছি না। যদি আমি এ রমযানের আগে আগে বিগত রমযানের রোযাগুলো রাখতে না পারি, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমি কি এ রমযানের পরেও রাখতে পারবো? না কি অন্য কোন উপায়? দয়া করে জানাবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাংলাদেশ।

**উত্তর:** নিয়ম হচ্ছে, রমযানের রোযা ভঙ্গ হলে তা আগামী রমযানের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাযা করে দেয়া। যদি কেউ সেটা না করে তবে সে গোনাহগার হবে। কিন্তু সেটা তাকে রমযানের পর হলেও কাযা করতে হবে। বাচ্চা দুধ না পেলে যদি বাচ্চার সমস্যা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয আছে।

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

**দৃষ্টি আকর্ষণ!**

## প্রিয় পাঠক!

শুধু কি পড়েই সন্তুষ্ট থাকবেন? অথচ "নির্মাণ" সময়ের এই বিনির্মাণে আপনার অংশগ্রহণ আন্তরিকভাবে আশা করছে। আপনার চিন্তা, ভাবনা, গবেষণা, অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, কাব্য প্রতিভা ইত্যাদি নিসৃত ভালো লেখাগুলো পাঠিয়ে দিন নির্মাণ বরাবর। নিজেকে ছড়িয়ে দিন সবার মাঝে। হয়ে উঠুন একজন- **"সময় নির্মাতা"**।

**ইমেইল:** nirmanmagazine@gmail.com **ওয়েবসাইট:** www.nirmanmagazine.com

# নির্মাণ

মননে. চিন্তায়.. গবেষণায়...

৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০১১ ইং